প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, কর্ণওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : নির্মল মুখোপাধ্যায়
মালা প্রেস
২৭৫, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

বাঁধাই :
মফিদর রহমান এণ্ড কোং

দিনের হিসাব

ভাবছিলাম—ক'বছর গেল ?

দিনমাসের পরিমাপ দিয়ে মানুষের অনেক কিছুই স্থির করা যায় না—তবু দিনমাস ছাড়া মানুষের হাতে অন্য প্রতিমান নেই। যা বহুদিন টেকে না আমরা তাকেই বলি 'ক্ষণস্থায়ী' এবং ক্ষণস্থায়ী জিনিসমাত্রই আমাদের বিবেচনায় অসত্য। সত্য যা তা হবে সৎ, চিরস্থায়ী। চির মানে দীর্ঘ ; কারণ অনাদিঅনন্ত কালের প্রবাহে যা খুব একটা বড় span, তাকেই আমরা কালের বুদ্‌বুদেরা, ধরে নিই eternal বা শাশ্বত বলে। অথচ কে জানে তা শাশ্বত কিনা ? বুদ্‌বুদের চোখে একটা নদীর ঘাটই শাশ্বত, তাতে ধাক্কা খেয়ে তার জীবন ফুট্‌ল, তার দিকে বিস্মিত চোখে দেখে একটু ভেসে চলতে-না-চলতেই গেল বুদ্‌বুদ্‌ ফেটে। বুদ্‌বুদ্‌ ভাববে—নদীর পারটা—অমনি শান বাঁধানো একটা ঘাট—আর কিছু নয়। সমস্ত ভূমণ্ডলের আয়ুষ্কালের তুলনায় মানুষের পরিজ্ঞাত ইতিহাস কি একটি বুদ্‌বুদের উত্থান-বিলয় অপেক্ষা বৃহত্তর ? অথচ, আমরা যাকে বলি eternal—যে-সব ভাবগত ও বস্তুগত factকে বলি চিরসত্য—একমাত্র পরিপ্রেক্ষিতে এই মানুষের ইতিহাস, তার একমাত্র মানদণ্ড সেই সুপরিজ্ঞাত যুগ কয়টির সাক্ষ্য। অতএব, মহাকাল মানে মোটামুটি আর-কিছু নয়, আমাদের জীবনের তুলনায় যা দীর্ঘকাল। জীবনের ক্ষণিকতায় আমরা এতই কাতর যে, যা দীর্ঘস্থায়ী তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, নিজেদের অপেক্ষা বড় বলে অনুভব করি। তাই, যা কালের পরীক্ষায় টেকে তাকেই আমরা বলি খাঁটি। অথচ কালের পরীক্ষায় যা টেকে না, তাই কি অসত্য ?

শাশ্বত কালের পরীক্ষায় তো বোধ হয় কিছুই টেকে না, যাকে আমরা fundamentals বলে ভাবি সে-সবও হয়ত আবেষ্টনাবর্তনের সঙ্গে উল্টে যাবে—শেক্‌স্পিয়র হবেন হাস্যকর। ধর্মপ্রেরণা মানুষের একটা ভ্রান্তি বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। Values-এর scientific revaluation-এ না থাকবে 'সুন্দরের' রহস্য, না থাকবে 'কল্যাণের' প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা। অর্থাৎ যা-কিছুকে আজ আমরা fundamentals বলে ভাবি, এমন কি সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা পর্যন্ত—সবই, হয়ত ভাবী কালে অবান্তর হবে, সেদিনের মানুষ বলবে: 'ইহ বাহ্যঃ'। তবু আজকের দিনে আমাদের কাছে তো এগুলি fundamentals, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। এখনকার মত এগুলিই সত্য—যদিও ভয় হয় এসব শাশ্বত নয়,—কারণ পৃথিবীতে কি যে শাশ্বত তা বলা শক্ত—এ পৃথিবী যখন ক্ষণিকের বন্যাস্রোত, eternal flux of things. অথচ মুশ্‌কিল এই যে, যা ক্ষণিক তাকেই আমরা অবিশ্বাস করি; কিছুতেই তাকে শ্রদ্ধা করতে পারি না। ক্ষণিকের প্রতি অবজ্ঞা বোধ হয় কতকাংশে 'সামাজিক'। যা অস্থায়ী তাকে বাড়ালে সমাজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিপদ ঘটবে। তাই, যে প্রেম পাঁচ দিনে শেষ হয় সমাজ তাকে মানতে চায় না; আবার তার আয়ু যদি পাঁচ হাজার দিনের হয় তা হলে তাই হবে পৃথিবীর একটা বড় সত্য। সমাজের এ মতটা নিতান্তই আত্মরক্ষার দায়ে। অবশ্য, স্বল্পস্থায়ীর প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধার অন্য কারণ আমাদের অমরত্বের লোভ এবং ফলে স্বল্পায়ু আমরা দেখি করুণা ও অনুকম্পার চোখে,—তা আমাদের চোখে নিতান্তই ব্যর্থ।

কিন্তু যতই ক্ষণকালের প্রতি আমাদের অবিশ্বাস থাক্‌, আমরা তাকে অস্বীকার করতে পারি না। স্বল্পজীবী মানুষের মনে নিত্যবোধ কি সহজে ফুটতে পায়? ক্ষণিকের জীব জানে জীবনই ত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তবু তাকে বেঁধে-ছেঁদে আঁকড়ে থাকবার কি বিপুল আকুতি! নিত্যকালের চোখে এই দৃশ্যটা নিশ্চয়ই যেমন তুচ্ছ তেমনি হাস্যকর;

কিন্তু ক্ষণিকের খেলনা মানুষ তাই উল্টো চোখে দেখে বলে: (হয়তো নিজের সান্ত্বনার জন্য?) দেখো আমার বিজয় যাত্রা,—দেখো আমার কালজয়ী বিরাট সঙ্কল্প। অর্থাৎ থাক্ ক্ষণিকের প্রতি তার অশ্রদ্ধা, তারই প্রতি তার তবু রয়েছে মায়া,—অনিত্যতা যে তার আপনার destiny. তাই জ্ঞানের চোখে বারবার যাকে বলে অস্থায়ী অতএব অবিশ্বাস্য, প্রাণের দাবিতে বারবার তাকে গ্রহণ করে, মানে তা স্বীকার্য। যে প্রেম পাঁচ দিনের, পৃথিবীতে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু সকলেই তার হাতে বহুবার ধরা দেয়। অবশ্য, অনেকেই মনে করে তা পাঁচদিনের বস্তু নয়, তা একেবারে চিরস্থায়ী, সৃষ্টির শেষ নিমেষ পর্যন্ত তার তীব্রতা থাকবে তেমনি উজ্জ্বল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুভ দৈবক্রমে, তা পাঁচ দশ বছর টিকে যায় এবং মৃত্যু যদি নিতান্ত পাঁচশত বছরের পারে না থাকে, তা হলে তা আমরণও স্থায়ী হয় (অবশ্য সব সময়ে তার তীব্রতা থাকে না, থাকলে মানুষ বলত 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি), তার নামে পূজা দেয় ও মঙ্গল বাদ্য ধ্বনিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তা ঘটে না, mutabilityর ধাক্কায় সব বদলে যায়—কিছুই বেশীক্ষণ টেকে না। তবু সেই পাঁচদিনের মধ্যে তার প্রতাপ কি কম? তখন তো জীবনের অপর ওরকম পাঁচ হাজার দিনকে মনে হয় নিতান্ত তুচ্ছ। কাল জিনিসটাই যখন নূতন আয়তনে অঙ্গীভূত হয়ে আমাদের চমকে দিচ্ছে, তখন ক্ষণকাল ও চিরকালের দ্বন্দ্ব কেন?

খবরের কাগজওয়ালা যখন বলে, আজকের দিনে আমাদের জীবনের চরম সমস্যা এই যে, চাই অন্ন, চাই বস্ত্র, তখন কিছুক্ষণের মত আমরাও মেতে উঠি। যখন চারিদিকে মাতামাতি লেগে যায় তখন আমরাও ক্ষেপে যাই, ভাবি স্বরাজ না হলে একটা নিমেষও নিঃশ্বাস টানা দুঃসহ ব্যাপার—ওটাই চরম সত্য। তারপর পুলিসের ডাণ্ডা পিঠে পড়ে, তখন জানি পিঠের ব্যথাটা বড় নিদারুণ। তখন

দেহ-তত্ত্বে ও ডাণ্ডা-সত্যেই বিশ্বাস হয়। ভাবি, দু'দিনের হুজুগ কিছু নয়, একটা মূঢ়তা। তখন খাই-দাই, ঘুমোই। পিঠের ঘা ক্রমে শুকিয়ে আসে, তার স্মৃতিও আর তেমন সুতীব্র থাকে না। আবার একটা জোর চেঁচামেচি কানের কাছে শুনতে পাই, রক্তটা চন্‌চন্‌ করে ওঠে। মন বলে, 'কিন্তু'। তারপর গোলমাল বাড়ে, পথের উন্মাদনা দুয়ারের কাছে এসে ঠেকে, বুকের রক্ত তোলপাড় শুরু করে দেয়, খাওয়া-দাওয়া-ঘুমোনো, 'art', 'flirt', 'smart'—সব হয়ে ওঠে মূল্যহীন, অর্থহীন। অতএব, তখন আবার দু'দিনের হুজুগের অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য যাই উত্তোলিত ডাণ্ডার সম্মুখে। কিম্বা এসে ঠেকি এই অন্তরায়িত অবরোধ ভবনে—আর ভাবি—ক' বছর গেল?

হাস্যকর কাণ্ড। কে না জানে এই কালস্রোতে পৃথিবীই একটি ক্ষণিক বুদ্‌বুদ্‌, জীবন তো নিমেষের ভর সয় না; মানুষের ইতিহাসে কিইবা এই ভূমিখণ্ড, কিইবা তার জীবগুলি, কিইবা তাদের স্বরাজ স্বাধীনতা। ক্রমধ্বংসমান এই পরিচিত ভূমণ্ডলের মধ্যে এই তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছ দেশ, জাতি, শ্রেণীবিভাগ নিয়ে মাতামাতি, এই কোলাহল, হাহাকার, গর্জন—vanity of vanities! কিন্তু তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে যদি এই নর্তন-কুর্দনের প্রতি ঔদাসীন্য জাগে, Jeans, Eddington পাঠের পরে চাক্‌মা dative-accusative 'কে'-বিভক্তির জন্য জিজ্ঞাসু হওয়া মনে হয় অনর্থক। টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি হলে চঞ্চল হওয়া, এম্পায়ার থিয়েটারে শ্রীহীন নৃত্য-বিলাসী ও নৃত্য-বিলাসিনীদের 'ইণ্ডিয়ান' নৃত্য-কলা নামীয় hybrid Indianism ও লাবণ্যহীন দেহোদ্ঘাটনে উপস্থিত থাকবার জন্য খুনোখুনি করা, কিম্বা কোন্‌ সুখ্যাত মাসিকপত্রের তিনশ তেইশ পাতার ডান কলমের মাথার দিকের উপরার্ধে কিম্বা নিম্নার্ধে কোন্‌ কবিতা বেরিয়েছে সে সম্পর্কে সাহিত্যিক 'এ'-বাবু, 'বি'-বাবু কিম্বা 'সি'-বাবু কোথায় কোন্‌ সুখ্যাতি করেছেন, তা শোনবার জন্যে বাস ফেয়ার দিয়ে উৎকণ্ঠিত, অধীর আগ্রহে তাঁদের

কারও বাড়ি গিয়ে ধন্না দেওয়া—এ সবেই বা কোন্ কাণ্ডজ্ঞান-যুক্ত মানুষের জুগুপ্সা না জাগে? আসলে পলিটিক্যাল আনন্দ-বিক্ষোভে মাতামাতি অন্য কোনোরূপ কাজের অপেক্ষা বেশী হাস্যকর নয়, লজ্জাজনক তো নয়ই। হয়ত প্রেমের মাতামাতিটাও ওরূপই। আর যা মাতামাতি নয়, প্রেমের সেই দিন-গুজরানো work-a-day রূপও কোনো অংশেই মাতামাতির চেয়ে উঁচুদরের জিনিস নয়। মহাকালের মুখোমুখি দাঁড়ালে কি আর রক্ষা থাকে? তবু মানুষ বলে: "আপাতত······আমি আছি বেঁচে"—অতএব আছে স্বরাজ এবং বন্দিশাল, আছে প্রেম আর এম্পায়ার থিয়েটার।

'আপাতত এখানেই আছি'—

মোটের উপর 'আপাতত' নিয়েই মানুষ দিন কাটায়; আর 'আপাতত' যে শাশ্বত নয় তা বলাই বাহুল্য। Sufficient unto the day is the truth thereof—এই হল পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে-চলা মানুষের philosophy—the philosophy he lives; (অবশ্য Beyond the mutability of things stands the eternal rock of truth. এই হল স্থিরতান্বেষী স্থায়িত্বকামী মানুষের philosophy—the philosophy that he knows)। অতএব, আপাততের খেলনা নিয়ে মনের কাচের আলমিরা সাজিয়েছি বলে লজ্জা কি? কখনো পড়ছি, কখনো লিখছি, বড় বড় ভাবনার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখতে চাইছি নিজের মুখচ্ছবি; ছোট ছোট যত তুচ্ছতার মধ্যে ভাসিয়ে দিইছি এই বদ্ধস্রোত দিনগুলি। আর কখনো এ দিনান্তে রাত্রি বারোটার পরে কাচের আলমিরাতে সাজাই এই ধূলি-ভরা দিনের ভাবনা—কখনো এক টুক্‌রা কথা, কখনো একটি অসার কল্পনা, স্মরণের এক ঝলকের ওপরে কখনো কল্পনার সাতটি রঙের ফুলঝুরি, একটি সম্ভবের সঙ্গে গেঁথে-ফেলা দশটি অসম্ভবের ফুল—সত্যের সঙ্গে সম্ভাবনার, সম্ভাবনার সঙ্গে অসম্ভবের—

তাতেই বা এমন লজ্জা কিসের! ভয় শুধু এই—যেন দিন-কাটাবার খেলা থেকে দিন-হরণের প্রহরীরা আদায় করে না বসে নতুন কোন ভুলের মাস্থল—অসম্ভবের সমুদ্রতল থেকে ডুবুরীরা তুলে না আনে গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্ত-ষড়যন্ত্র। আপাতত এখানকার নিয়ম এবং এখানকার এই সম্ভাবনাকেই বা না মেনে আমাদের পথ কোথায়? বড়-ছোট, যা আমার আনন্দ-বেদনা, তা আমার হলেও, তা সঞ্চয়ের অধিকার আমার নেই এখানে। হায় রে হৃদয়! তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

মানুষের জীবনেরই ধর্ম তবু এই যে, সে day-to-day খেলাই খেলে চলে। মহাকাল যতই সে খেলাকে ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দিক না, আজকের বিকালে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের খেলা একটা বিষম serious ব্যাপার, খেলোয়াড়দের নিকট একমাত্র সত্য এবং দর্শকদের কাছেও আপিস-আদালত, ছেলের ব্যামো, দাম্পত্য কলহের অপেক্ষা কম সত্য নয়। দু'বছরের পলিটিক্যাল bedlam কি তৎপরবর্তী দশ বছরের হিসাবী ব্যবসাদারির অপেক্ষা কম সত্য? না, দিন পাঁচেকের 'চোখের নেশা' পঞ্চাশ বছরের অখণ্ডিত ভালোবাসার থেকে কোনো অংশে কম তীব্র?

ফিলজফির পাল্লায় পড়লে মানুষ শেখে অনেক, করতে পারে না কিছুই। 'কৃ' ধাতুকে নিস্তেজ করবার মন্ত্রই হল 'ফিলজফি'—উপরোক্ত তর্কের থেকে সুনীল এসে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। কোনো Epistemological সমস্যাতেই তাই সুনীল কান দিতে চায় না—অথচ ওর মনের ছাঁচ হচ্ছে intellectual. Thinking is at best living at second hand—জীবনের পরোক্ষ পরিচয়। আর at the worst? তাতে livingএর প্রতিই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জাগে অর্থাৎ মানুষ হয় sceptic ও cynic. কাজেই 'শতহস্তেন' ফিলজফিকে এড়িয়ে এসে আমরা আপাতত যা কর্তব্য এবং 'কার্যত যা সত্য' বলে জানছি তাই গ্রহণ করি—এই হল সুনীলের কথা। বলা

বাহুল্য, এ দৃষ্টিকে positivist বলি বা pragmatist বলি তাতে যায় আসে না—দু'একজন অরবিন্দ ছাড়া অন্য সকলেও প্রকৃতপক্ষে এভাবেই চল্‌ছেন—তা তিনি অধ্যাপকই হোন আর অধ্যাত্মবাদীই হোন। তবে এরই মধ্যে হয়ত কেউ insure করেন, কন্যার বিবাহের জন্য টাকা জমান, এমন কি, কত টাকা জমিয়ে কি করবেন সে সম্বন্ধে প্ল্যানও এঁচে ফেলেন—এবং স্তালিনের অপেক্ষাও একাগ্রচিত্তে তা সার্থক করে তবে চোখ বুঝতে রাজী হন। কিন্তু সে প্ল্যানই বা কত দিনের? আসলে আপাততই। না না, মূঢ় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণাং বলে আমি 'মোহমুদ্‌গর' আওড়াচ্ছি না। অস্থায়ী বলেই কোনো জিনিস 'অসত্য' এতবড় তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী নই। ক্ষণিককে আমি অস্বীকার তো করিই না, অবিশ্বাসও করি না। সুনীলও করে না।

সুনীলের কথা ধরা যাক্—তার সঙ্গে আমার পরিচয় দু'মাস-আড়াই মাসের হবে। আজ সে চলে গেল, হয়ত ভবিষ্যতে কোনোকালে তার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ ঘটবে না। কিন্তু এই মাস দুয়েকের একত্র অবস্থানে ইতিমধ্যেই তার প্রতি যথেষ্ট মায়া বসে গেছে। আর শুধু কি আমারই একা এই মমতা জেগেছে? এখানকার আরও দু'চারটি সতীর্থেরও দেখছি সুনীলের জন্য বেশ-একটু দরদ জন্মেছে। অথচ সুনীল সে-জাতের ছেলেও নয় যারা বেশ রূপবান, handsome, বা জোর-personality-সম্পন্ন বা তুখোড়। রূপের দিক থেকে সে যুবকটি আমাকেও লজ্জা দেয়। চলনে যে একটি সপ্রতিভতা আছে তাতে খানিকটা বুঝা যায় লোকটা মূর্খ নয়। নইলে ওকে দেখে কে বুঝবে যে, এ মানুষটি সুকুমার বৃত্তির বা তীক্ষ্ণ চিন্তার ধার ধারে। এসম্পর্কে ওর নিজেরই একটা গল্প বেশ কৌতুককর। ঘুরতে বেরিয়ে দুই বন্ধুতে ওরা এক সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে অতিথি হয়। খুব সমাদর করে ভদ্রলোক ওদের রাখেন, নানা আপ্যায়নে ওদের অত্যন্ত বাধিত করে ফেললেন। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে দুই বন্ধু অবশেষে তাঁর ক্যামেরার

সামনে একটিবার দাঁড়াতেও রাজী হয়—এ কাজটাতে তারা কিছুতেই কারও কাছে স্বীকৃত হত না। কিন্তু ভদ্রলোকটি ছাড়েন না,—মহা পীড়াপীড়ি। কিছুতেই বলেন-ও না কেন তাঁর এ আগ্রহ। শেষটা বললেন: আচ্ছা, যাবার সময় বলব—কিন্তু রাগ করবেন না যেন। ফটো তোলা হল—ভদ্রলোক অতিথিদের বিদায় দিতে অনেকটা পথ এগিয়ে গেলেন। একখানে এসে বিদায় চাইলেন, নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, শিষ্টাচার দু'পক্ষেই যথেষ্ট হল। তখন ভদ্রলোককে দুই বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন: ফটো কেন নিলেন, তাতো এখনো বললেন না?

ভদ্রলোক হেসে চলে যেতে যেতে বললেন: সে আর কি হবে শুনে?

অতিথিরা বললে: না, না, আপনি যে বলবেন বলেছেন?

—কিন্তু আপনারা শুনে মারতে আসবেন না তো?

—সে কি কথা! কেন আপনি আমাদের ঠাট্টা করছেন?

—তা হলে বলি, বলে দু'পা পিছিয়ে ভদ্রলোক বললেন: দেখুন, আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু সত্যিকারের পাকা বদমায়েশের চেহারা আমি কোথাও পাইনি—আপনাদের পেয়ে আশা পূর্ণ হল। —বলেই তাড়াতাড়ি একেবারে ছুটে পালালেন। দুই বন্ধু খানিকক্ষণ পর্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর আবার পথ চল্‌ল।

গল্পটা সত্য, শুধু আখ্যান হিসাবে নয়, ভদ্রলোকের বক্তব্য হিসাবেও। সুনীলকে দেখে মানুষ অন্য কিছু ভাবতে পারে না। ওর বন্ধুটির দুর্দশার কারণ অবশ্য সুনীলের সাহচর্য। তথাপি সুনীলের সঙ্গে দু'দশদিন কাটালে মানুষ আর একটা সত্যও উপলব্ধি করে—appearances are deceptive. আমরা তো অন্তত দু'মাস-আড়াই মাসে বুঝেছি, ওর বুদ্ধির ধার বিষম জিনিস, কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস ওর হৃদয়ের শোভনতা। স্নানের বেলায় আজ ওর পরিহাস-মিশ্রিত তাগিদ পাইনি, খেতে বসে নিজে দেরি করার জন্য সেই সুপরিচিত

অনুযোগ—'প্রতিদিন আপনারা দেরি করছেন—শরীর আপনাদের থাকবে কি করে?'—আজ শোনা গেল না। তুপুরে এই বিষম গরমে ওর ঘুম নিয়ে ওকে আজ কেউ ঠাট্টা করতে পারিনি। বিকালে আর স্নানে-ভ্রমণে ওর দেখা নেই। সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে সেই হাসি-আনন্দ-মিশ্রিত তর্ক-পরিহাস-সমাকুল আড্ডায় ওকে আর পাওয়া গেল না। অবশ্য আজ বারে বারে মনে পড়ল ওর কথা। কিন্তু, এক সপ্তাহ পরে আমাদের কারও কাছে আর ওর অনুপস্থিতি এমন উল্লেখযোগ্য ঠেকবে না। অলক্ষিতে ও সরে গিয়ে মনের নেপথ্য ঘরে ঠাঁই নেবে আরও কতজন বন্ধুর মত। ওর সঙ্গে পরিচয় দীর্ঘীকৃত হলেই যে ওকে আরও বেশী করে জানা বা বুঝা যেত এমনও নয়, কারণ, এ তু'মাস-আড়াই মাসের মেলামেশায় ওকে যথেষ্টই জানা গেছে—যতটুকু মানুষে মানুষকে জান্‌তে পায়। তবে, আড়াই বছরে এর চেয়ে বেশী কি হত যাতে ওর দাগ পরবর্তীরাও দেখতে পেতেন? কিছুই হত না, অথবা যা হত সম্ভবতঃ তা এই যে, নিছক সময়ের ঘষায় ঘষায় এই পরিচয়-রেখাগুলি কেটে কেটে মনের পাতে বস্‌তে পেত,—তাতেই পরবর্তী কালেও সেই শিলালিপি পাঠ করে লোকে—এমন কি, আমরা নিজেরাও,—বলতাম: এই দেখো, সুনীলের স্বাক্ষর। কিন্তু স্বাক্ষর যে করে না, বা করবার অবসর পায় না, এমন লোকই অধিক। তাদের কোনো দানই জীবন বহন করে না—পৃথিবীতে তার আগমন-প্রয়াণের কোনো চিহ্ন নেই। আর চিহ্ন যার নেই তারই মূল্য নেই—কারণ চিহ্ন হল স্থায়িত্বের নজরানা। অস্থায়ীকে আমরা কে মূল্য দিই?

রবীন্দ্রনাথ হয়ত বলবেন,

"নহে, নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহারিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সঙ্গোপনে—"

আজ এই রাত্রি বারোটার পরে যেমন এখানে এই 'নিগূঢ় ধ্যানের

রাত্রির' সীমানা ছোঁয় আমার মন কালি-কলম দিয়ে, তেমনি কোনো ধ্যানের রাত্রি আছে নাকি অপেক্ষায়—যখন আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝব—একদিকে সেই মহাশূন্যের সভায় ওসব স্থায়ী আর অস্থায়ী কারও মূল্য কিছুই নেই—অন্য দিকে মনের অগোচরে যার যা মূল্য তা জমা হয়ে থাকে নির্ভুল ভাবেই—তার আয়ু প্রহর দণ্ড গুনে নয়? এসব কথা কবিতায় ভালো লাগে—রাত বারোটার সত্য বলেই ও মানতে পারা যায়। কিন্তু কাল সকালে যখন দিনের ডাক আসবে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে—কে ফিরে তাকাবে এই পিছনে-ফেলা বাসী ফুলের দিকে তখন? আসলে ওই ক্ষণিকা ও শাশ্বতীর ফিলজফিটার কোনো মানে নেই। ওর চেয়ে ঢের সত্য হচ্ছে এই কথা—যা আসে তাকে গ্রহণ করো—গ্রহণ করতে জানলেই তার সার্থকতা আর আমার সার্থকতা :

For, we must endure
Our going hence e'en as our coming hither—
Ripeness is all.

ফিরে ফিরে ওই কথাতেই আসতে হয়—Ripeness is all. কিন্তু কার পক্ষে কিসে সেই ripeness? Ah, there's the rub! অভিজ্ঞতাই জীবন—কিন্তু যা কিছু ঘটে তা সবই যে অভিজ্ঞতার খাতায় জমা হয়, এখন নয়। আবার, কার খাতায় কি যে জমা পড়বে, আর কি যে জমা পড়বে না, তাও অনিশ্চিত। আমিও জানি না কি জমছে আমার জমা-খরচের খাতায়। কি যে হারাচ্ছি তা জানি—সকলেই তা জানি—'যৌবন-বেদনা' রসে উচ্ছল সেই দিনগুলি 'নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া' কোনো দেবতা রাখবেন এ আশাও একেবারে নেই তা নয়। হয়ত কোনো সুদূর দশকে সহস্র সহস্র এই অপহৃত যৌবনের স্বপ্ন এদেশের কানায় কানায় সত্য হয়ে, আনন্দ হয়ে উঠবে—অর্থাৎ ভুলে-ভ্রান্তিতে, তুচ্ছতায় মহত্ত্বে এদেশ পাবে আপনার স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ। এ খাতায় সেই আগামী

দিনের সম্ভাবনাকে জমার নগদ হিসাবে ধরার লোভ দুর্জয়। অবশ্য এই সম্ভাবনাটাকে বাদ দিলে আমাদের জীবনের হিসাবই শূন্য হয়ে যাবে—ripenessএর কোনো আভাস আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে সে খাতায়। নগদের হিসাবে নিলে আমরা তো প্রায় দেউলে কারবারী—কিন্তু এই আমাদের ফেল-করা দিনরাত্রির মধ্য দিয়ে আমরা কিছুই পাইনি, এমন কথাই কি বলতে পারি?

যখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করি—কত দিন গেল? তখন নিজেকে আবার ফিরে জিজ্ঞাসাও করতে পারি—দিন তো যায়ই, যাবেই। কাজেই প্রশ্নটা শুধু এ নয়—কত বছর গেল—প্রশ্নটা এও—কী দিয়ে গেল তোমাকে এ ক'বছর? কিন্তু আর একটি প্রশ্নও আছে—আর ক'বছর যাবে এমনি?

আর্ট ও আসঙ্গ

সেদিন নিতু জানিয়েছিল, দাদা সায়েন্স কংগ্রেসের সভায় আর্ট ও আনকনশাস নামীয় এক প্রবন্ধ পড়েছেন, কলকাতার সব কাগজে তা বেরিয়েছে, আমি যেন পড়ে দেখি। 'স্টেট্স্‌ম্যান' সে বক্তৃতা ছাপেনি—কারণ, 'স্টেট্স্‌ম্যান' স্বভাবতঃ 'টাইম্‌সের' পদানুসারী এবং যে সায়েন্স পাকা হয়ে ঝুনো হয়নি তাকে স্বীকার করতে নারাজ। নীতিটা মন্দ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডনদের পক্ষে অবশ্য নতুনের সম্পর্কে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা এরূপই হয়। যারা সাধারণ মানুষ তাদের পক্ষে-ও 'হালে যেখানে পানি পাওয়া যায় না' সেখানে না-নামাই সুবুদ্ধি। কিন্তু খবরের কাগজের পক্ষে কি নীতিটা খুব সুবিধার? লর্ড নর্থক্লিপ নাকি টাইম্‌সের কর্তৃপক্ষকে একবার পরিহাস করেছিলেন: The Times appears to believe that news like wine improve by being kept and stored. নিউজ সম্পর্কে 'টাইম্‌স' সে অপবাদ আজকাল ক্ষালন করতে সর্বদাই তৈয়ারী। স্টেট্স্‌ম্যান-ও সংবাদ সম্পর্কে হাল-নিয়মের পক্ষপাতী। তবে তার সংবাদ হয়ত আমার সংবাদ নয়। আমার ঔৎসুক্য বা আগ্রহ তার সব নিউজে চরিতার্থ করতে পারে না। কারণ তার পাঠক-সমাজের সাধারণ রুচি আমার রুচি থেকে স্বতন্ত্র হওয়াই সম্ভব। আর সে যখন সংবাদব্যবসায়ী তখন আপন পাঠক-সমাজের রুচি মাফিকই চলবে।

অবশ্য বুঝি স্টেট্স্‌ম্যান আমাদের রুচিকেও আজকাল খানিকটা আমল দেয়—তার একটা চোখ আমাদের পকেটের দিকেও আছে। শুধু ক্লাইব স্ট্রীটের বড়সাহেবের জন্যই সে আর কাগজ

ছাপে না, সে চায় largest circulation, তাহলে কালা-আদমীকেও ভোলা উচিত নয়। তার নিজের পরিচয় দিতে হয় national paper বলে। national অর্থ nationalist নয়, মাত্র সর্বত্রপ্রচারিত। Dominon Status কথাটির জন্য আমাদের হয়ে Statesman ওকালতি করে, এমন কি 'বেঙ্গলী লিটারেচার', 'বেঙ্গলী আর্ট ও কালচার'কেও এককোণে মাঝে মাঝে ঠাঁই দেয়। কিন্তু তবু এখনো তার আসল খদ্দের 'বড়সাহেবরা'। তার স্বার্থের বাঁধন ও রক্তের বাঁধন ক্লাইব স্ট্রীটের সঙ্গে। বড়-বাজারের ব্যবসায়ী ও বালিগঞ্জের ব্যারিস্টোক্রাসির জন্যে তার দুর্ভাবনা নেই—তারা ক্লাইব স্ট্রীটের বাসী এঁটোপাতেই বসে যাবে। কলেজ স্ট্রীট নিয়েই ভাবনা—সেখানে স্টেট্‌স্‌ম্যান খুব সাবধানে পা ফেলে। কারণ, কে বলতে পারে কলেজ স্ট্রীট-ও ধীরে ধীরে বউবাজার বা ধর্মতলার মত ট্যাঁস হয়ে উঠবে না? তাহলে কোনো অসুবিধাই থাকবে না। ইতিমধ্যে দু'-একটি ছিটেফোঁটায় যদি ওদের ট্যাঁকের পয়সা খসে তাহলে তা বুঝেসুঝে ছিটিয়ে দাও। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' তাই আজ বাঙালী রুচিকে বরদাস্ত করে, ভরসা রাখে বাঙালী রুচিকেও অজ্ঞাতসারে ফিরিঙ্গী রুচিতে সে বদলে দিতে পারবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য পূর্ণ করার জন্যে সে খবর সাজায় না। তাই নিউজের ফিলজফির মূলসূত্র অনুযায়ী 'স্টেট্‌স্‌ম্যানের' নিউজ আমার নিউজ নয়—আমার ঔৎসুক্য পূরণের জন্যে সে সংবাদ খোঁজে না। সে ফিলজফির দ্বিতীয় সূত্র কিন্তু সর্বত্রই খাটে অর্থাৎ 'স্টেট্‌স্‌ম্যানের' নিউজ সত্যি সত্যি 'নিউ'—বাসী নয়। বাসী ফুলে দেবতার চলে না, বাসী প্রেমে মানুষের অরুচি আর বাসী খবরেই কি মানুষের পোষাবে? মানুষের interest হল টাটকা, তাজা খবরে, নতুন প্রেমে। তার সর্বযুগের মন্ত্র হল, 'নতুন কিছু করো রে ভাই নতুন কিছু করো'। অতএব 'নতুন খবর' জিনিসটা প্রধানতঃ মানুষের ঔৎসুক্যের তাগিদেই—

নতুনত্ব তার ঔৎসুক্যের বা interest-এর corollary। তবু স্টেট্‌স্‌-ম্যান নববিজ্ঞানের enfant terrible নয়। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে নিজের মনঃস্থির করতে পারেনি—তাই বুদ্ধিমানের মত পাশ কাটিয়ে যায়। অতএব আমরা আর্ট ও আনকনশাস প্রবন্ধ দেখতে পেলাম না। নিতুকে বল্লাম, আমাকে যেন কাটিং পাঠানো হয়। অবশ্য, প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অনেকটা আমার জানা আছে। লেখকের সঙ্গে আজ ১৭।১৮ বৎসর ছায়ার মত ঘুরে ঘুরে ওঁর চিন্তাজগতের প্রায় সমস্ত রেখাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছি। ওটা-ও তাঁর গুণ; কারণ, উনিই আমাদের টেনে ওঁর চিন্তাজগতের মাঝখানে নিয়ে যেতেন। হয়ত তিনিই কিছুদিনের মধ্যে এই প্রবন্ধও আমার হাতে পৌঁছে দেবেন, আমি তা সম্পূর্ণ জানতে পারব।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্বে আমি কোনোদিনই বিশ্বাস রাখি না। হয়ত আর্ট ও আন্‌কন্‌শাসের প্রতিপাদ্য কথা-ও আমার নিকটে কষ্টকল্পিত আধা-সত্য বলে ঠেকবে। পৃথিবীতে যারা নতুন কোনো তথ্যের সন্ধান পায় তারা আবিষ্কারের উত্তেজনায় সে তথ্যকেই পৃথিবীর চরম সত্য বলে ধরে নেয়—পৃথিবীর জ্ঞান-জগতেও বিষম রকমের একেশ্বরবাদ ক্ষণে ক্ষণে প্রচারিত হচ্ছে আর তাদের চ্যালারা গলার জোরে ও পুনরুক্তির সাহায্যে গুরুদের ছাড়িয়ে যায়! মার্ক্‌স্‌-এর শিষ্যগণ এখানে জড়বাদের জয়-জয়কার করে বেড়ান, অথচ ঊনবিংশ শতকের জড়বাদ আজ বিজ্ঞানের জগতেও আর মর্যাদা পায় না। ব্রাহ্মসমাজের কর্তারা এখনো বলেন 'রাজা'ই এই যুগের পয়গম্বর আর ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্‌। অথচ রাজার পরেও দেশে জ্ঞানী লোক জন্মাচ্ছে আর ব্রহ্মের এত বৎসরের কৃপাতেও বঙ্গদেশ 'ব্রহ্মদেশ' হল না। চরকার মাহাত্ম্য কত কি তা কে না বলেছে—আমিও বাদ যাইনি—কোনো-কোনো বীরাঙ্গনা চরকা-চক্রেই ব্রিটিশ সিংহকে দ্বিখণ্ডিত করবেন স্থির করেছিলেন। খাগের কলম ও দেশী কাগজের প্রচলনের দ্বারা

ভারতবর্ষের পল্লীজীবনের আর্থিক মুক্তির পথ পরিষ্কার হবে,—নিতান্ত দুঃসময়ে হলেও এই কথাটা বহুলোকের বলতে বাধছে না। সেণ্ট সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের শিষ্যদেরই বা দোষ দেব কেন? তাঁরা যদি মনে করেন, সমস্ত সৃষ্টির মূলে যখন দেবাদিদেব লিঙ্গেশ্বর—"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টু্যরাদ্যা" তা যখন আমাদের এই লিঙ্গ-দেবতা,—তখন সমস্ত কল্পনা-জল্পনা, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, কথাবার্তা, লেখাপড়া, কিছু করা বা কিছু না-করা, সকল মানবীয় প্রয়াসই সেই লিঙ্গেশ্বরের প্রকট বা প্রচ্ছন্ন বিলাস। অভ্রান্ত যুক্তি'! মূল যখন পাঁকে, তখন পঙ্কজের সমস্ত জীবন—তার রূপ রস ঔজ্জ্বল্য, সমস্ত-কিছুর একমাত্র অভ্রান্ত Explanation ওই পঙ্কশয্যা। ফুল ত মূলেরই একটা রূপ মাত্র। এই পর্যন্তও বেশ চলেছে মানতে পারি। কিন্তু যখন ফুলের মধ্যে মূলের রূপ কি করে অনুস্যূত হয়েছে তার ব্যাখ্যান চলে তখনই মানতে একটু অসুবিধা হয়। আমাদের কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত যুক্তিবৃত্তি হঠাৎ যেন একেবারে নববিজ্ঞানের Indeterminism-এর আবর্তে পড়ে তলিয়ে যায়। মানলাম না হয়, রিলিজিয়নের অনেকটাই হয়ত বিস্মৃত যৌনাকাঙ্ক্ষার দান, কিন্তু ম্যাজিক ও ভূতের ভয় কি তার চেয়ে কম শক্তি জুগিয়েছে? আর মানুষের মৃত্যু-রহস্যও কি খানিকটা ধর্মের দিকে তার মনকে তাড়া দেয়নি? অথবা মন নামক রহস্যময় জিনিসের একটা মৌলিক স্বভাবই কি এই নয় যে, সে বস্তু-জগতের আদিঅন্তহীন হেতুর সম্পর্কে উদাসীন হতে পারে না। অকারণে অনাদি-কারণের জন্য ভাবতে থাকে, অজ্ঞাতকে জানবার জন্য উৎসুক হয়, তা অজ্ঞেয় বলে জানলেও কিছুতেই তা মানতে চায় না? জানি, এই কথায় অনেকগুলো কঠিন আপত্তি হবে। 'রিলিজিয়ন কি? তার মূল কোথায়?' প্রথম একদফা এই সব প্রশ্নের মীমাংসা দরকার, এবং এর প্রত্যেকটি কথাতেই পক্ষ-প্রতিপক্ষের এত যুক্তি আছে যে, শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে অবিসংবাদিতরূপে পৌঁছানো যায় না।

যদি বা এই দফা প্রশ্নের পাশ কাটানো গেল, অমনি প্রশ্ন হবে মানুষের মন নিয়ে। মানুষের মন জিনিসটা কি? মনোবিজ্ঞানই ত তার সঠিক খবর বলতে পারবে, অন্যান্য লোক ত' এ সম্পর্কে আদার ব্যাপারী, মন নামক সচল জাহাজের খবর তারা কি জানবে? শুধু কি সচল জাহাজ? মনোবৈজ্ঞানিক বলবেন: 'না, মন আবার ডুবু জাহাজও। তাছাড়া আবার এমনিতর জাহাজ that sails under many colours.' এতদিন সবাই নিশান দেখেই মেনে নিয়েছে এ জাহাজ কোন্ কোম্পানির। জান্‌তো না যে এ জাহাজ চোরা নিশান উড়িয়ে ফাঁকি দেয়। জান্‌তো না, ডুবু জাহাজের হাতে সর্বদাই আমাদের ভারী মানোয়ারী ফুটো হয়ে ঘায়েল হচ্ছে, অনেকক্ষেত্রে একেবারে অচল হয়ে মারা যাচ্ছে। ডুবু জাহাজের অস্তিত্বটাই এতদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডই হলেন প্রথম আবিষ্কারক এই 'submarine' mind অর্থাৎ unconscious mind-এর। তৎপূর্ব পর্যন্ত আমাদের psychology যদি বা shipping intelligence দিত সে এযুগের পক্ষে হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য। অতএব, 'মনের স্বভাব' জানেন একমাত্র মনোবৈজ্ঞানিক।

কিন্তু আমরা যে মনোবৈজ্ঞানিকের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়েই প্রশ্ন তুলেছি। এস্থলে 'মনোবিজ্ঞানের প্রমাণ মনোবৈজ্ঞানিকের কথা' বললে তা এদেশীয় সরকারী যুক্তির মত শোনায়—'আমি অভ্রান্ত; তার প্রমাণ আমার কথা।' মনোবৈজ্ঞানিক অন্যান্য বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের মত হেসে বলবেন: তুমি ত বিশেষজ্ঞ নও, তুমি বুঝবে কি? তুমি কি আইনস্টাইনের যুক্তি যাচাই করেছ? তবে তা মানো কেন? মানো, কারণ, বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের কথা আপামর সাধারণের মেনে নিতে হয়। তেমনি মনোবিজ্ঞানের বেলা-ও সে বিজ্ঞানের specialist-এর opinion গ্রহণ করাই তোমার মত আনাড়ীর পক্ষে যুক্তিকর।

কথাটা খাঁটি—বিদ্যা জিনিসটাই বড় টেকনিক্যাল হয়ে উঠেছে।

আমাদের মত ইতর-সাধারণ আর তা যাচাই করবার সাহস করতে পারে না। কিন্তু একটু বোধ হয় তবু গোল হচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানের কঠিন সূত্র যে যাচাই করতে পারি না, তার কারণ, ওর জটিলতা আমরা বুঝি না। 'পদার্থ' জিনিসটাই অনেকাংশে আমাদের নিকট দূর—আমরা নিতান্ত অপদার্থ বলেই। মনোবিজ্ঞানের বেলা কিন্তু এই কথা বলা চলে যে, সে বিজ্ঞানের যুক্তি (না, অ-যুক্তি ?) আমরা বুঝি, তবে তা আমরা শুদ্ধ বা যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিতে পারি না। প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আমার টান ঈদিপাস কমপ্লেক্স-এর জন্য,—এই কথাটার অর্থ বুঝতে আমার অসুবিধা হয় না, কিন্তু মানতে খানিকটা অসুবিধা হয়। মনোবৈজ্ঞানিক হয়ত হেসে বলবেন: 'ওটা অচেতন মনের ধর্ম, তাইতে তুমি মানছ না। আর এই যে মানছ না, তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ওটা সত্য। কারণ সচেতন সামাজিক মনের চেষ্টাই হল এই অচেতন মনকে দাবিয়ে রাখা।' মনোবৈজ্ঞানিকের কথা হচ্ছে: "অয়, z-নৃতি পার না" (Vide চিকিৎসা সংকট) অথবা 'না' মানেই 'হ্যাঁ' (Vide বিরিঞ্চি বাবা)। এ একটি dilemma, যথা, আমার কথা মানো ? তাহলে ত' কথাই নাই। কিন্তু আমার কথা মানো না ? তাহলে না-মানাই হল খাঁটি মানার লক্ষণ,—ব্যস্, আর কথা নাই। এ ডায়লেমার উত্তর-ও তেমনিতর ডায়লেমায় সাজানো যায়। অচেতন মনের নিয়মই হল অচেতনের কথাকে সচেতনের পোশাকী বেশে ঢেকে ঢুকে মনের কথা বলে চালিয়ে দেওয়া। এমন কি, সচেতনও তা জানে না। না জেনে ভাবে ওসব তার নিজের কথা। আর তাই তারস্বরে মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনে তার এই অস্বীকার। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিকের বেলা কি এসব কথা খাটে না ? তাঁর সচেতন মন তো নিশ্চয়ই অকেজো ? তা হলে তাঁর যুক্তি-যোজনের ক্ষমতা নেই, অর্থাৎ তাঁর গবেষণা হল অযুক্তিকর। আবার, তাঁর সচেতন মন যদি কর্মক্ষম-ও থেকে থাকে, তাহলে-ও বলতে পারি,

তিনি যে যুক্তি সাজাচ্ছেন তা তাঁর অচেতন মনের প্রচ্ছন্ন তাগিদে —আপনার অচেতন ইচ্ছার দ্বারা তিনি এই মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-শালায়ও পরিচালিত হচ্ছেন। তিনি হয়ত অস্বীকার করবেন, একথা মানবেন না, কিন্তু তাতে কি? তাঁর অচেতন আকাঙ্ক্ষাটাই কি তিনি জানেন? মনোবৈজ্ঞানিকইও তো অচেতনের সুতোর টানে বুলি আওড়াচ্ছেন—আর সে বুলির নাম দিচ্ছেন মনোবিজ্ঞান। যুক্তিগুলি দুদিকেই কাটে—অন্তত আমাদের তাই মনে হয়।

একটি কথা বুঝে দেখা উচিত—আমি মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বে কতটা বিশ্বাসী?—অনেকটা। / প্রায় আধাআধি। অর্থাৎ আমি যখন মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যান শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসি তখন নিতান্তই চিরাগত সংস্কারের বশে আপত্তি করি না। অনেকাংশেই আমি পেরোনিয়া; কমপ্লেক্স, অটো-ইরোটিসিজম, এনাল-ইরোটিসিজম, —এমনকি ঈদিপাস কমপ্লেক্স পর্যন্ত মানি। ফ্রয়েডের Totem and Taboo পড়ে স্বীকার করতে হয় যে, অনেক বিধি-নিষেধের মূলেই এই সব যৌনাকাঙ্ক্ষা সুগুপ্ত ছিল। মন চিরদিনই ছিল সুমতি-কুমতির বিরোধক্ষেত্র। আদিম মানুষের মনও ছিল এই অচেতন-সচেতনের যুদ্ধক্ষেত্র; তবে সেখানে অচেতন অতটা ছদ্মবেশ ধারণ করেনি। শিশুমন ও উন্মাদের মন আদিম সহজ মনেরই শামিল; তাতেও এই সব যৌন-কামনার প্রভাব প্রবল দেখা যায়। স্বপ্নেও মানুষের মন তার কষ্ট-আয়ত্ত যুক্তি-নিয়ম হারিয়ে সহজ অবস্থায় ফিরে যায়। অথ ফলম্? বলা কি প্রয়োজন? স্বপ্নক্ষেত্র যে অদ্ভুত ও বীভৎস কামনার লীলাক্ষেত্র এ প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত। এই সব data থেকেই মানুষের মনের 'মৌলিক ধর্ম' বোধ হয় ফ্রয়েডীয়রা আন্দাজ করেন। কিন্তু আপত্তিটা এই—এসবই হল মানুষের অসুস্থ ও অস্বাভাবিক কতকগুলি Exceptional stage-এর কথা। সুস্থ, সহজ মানুষও অমনিতর 'সহজিয়া' মানুষ;—শিশু বা অসুস্থ আদিম মানুষের পক্ষে যা সত্য, সাধারণ স্বাভাবিক

মানুষের পক্ষেও তাই সত্য,—এমন সিদ্ধান্তের হেতু কি?—এ হল একটা বড় আপত্তি। আমি অবশ্য মনে করি, মানুষ আসলে মনের গোপন তলায় সহজিয়াই রয়েছে; সভ্যতার পালিশের নীচে আদিম মানুষ বেঁচে আছে। আর ম্যাক্ডুগাল যতই বলুন যে, সেই অসুস্থ প্রবৃত্তিগুলি যেমন instinctive তাকে দমন করবার ইচ্ছাও ততোধিক instinctive, নাহলে সভ্যতা জন্মাত না, সমাজ টিক্ত না, আমি মনে করি আদিম কামনা মরেনি। কিন্তু যা আমি বুঝি না—অথবা মানি না—সে হচ্ছে ফ্রয়েডীয় 'রূপকবাদের' বিপরীত বাড়াবাড়ি। 'শিহরিল দেওদার বন'—এ যে নিতান্তই একটা দৈনন্দিন রূপক (অবশ্য, অচেতন) তা মানতে একটু হাসি পায়। 'আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে'—ইচ্ছাটা নিতান্তই যে, যেখান থেকে এসেছি সেখানে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা, তা সত্য। কিন্তু এই জাতীয় যে-কোন ইচ্ছাই একমাত্র ঈদিপাস কমপ্লেক্স-এর ছদ্মবেশ, এ মান্তে আমার বাধে। 'দেওদার' একটা বাস্তব জিনিস, তার 'শিহরণও' খুব প্রত্যক্ষ ঘটনা,—এই কথাই কি যথেষ্ট নয় ঐ লাইনটি লেখার পক্ষে? কালিদাসের কাব্য পাঠে স্বভাবতঃই সেকালের প্রতি লোভ জাগে, তাই লেখা হয়, 'আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে'। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক বলবেন, অত গাছ থাকতে দেওদার কেন ভালো লাগে? আর, সকলের কাছেই অতীতকালের মোহ কেন বড়? তা বুঝতে হলে—মনোবৈজ্ঞানিকের মতে,—জানতে হয় অচেতন মনের প্রকৃতি ও তার অমোঘত্ব। তা জেনে এবং মেনেও আমি তাঁদের মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ঠিক ধরতে পারি না। লম্বকর্ণের শিং বংশলোচনবাবুর গৃহিণী সোনা দিয়ে বাঁধালেন কেন? শিং একটি রূপক মাত্র—অর্থাৎ যৌন-রূপক। শুনে লম্বকর্ণের লেখক বল্লেন, সব জিনিসই হয় লম্বা নাহয় চ্যাপ্টা; তাহলে একটা-না-একটা ফ্রয়েডীয় রূপক হবেই। এই কথাটাই আমার-ও বক্তব্য—রূপমাত্রই মনোবৈজ্ঞানিকের কাছে রূপক হয়ে

উঠ্‌ছে। যখন শুনব যে, আর্টের মূলীভূত কারণ অবরুদ্ধ anal-eroticism এবং auto-eroticism, কি কোনোরূপ একটা কমপ্লেক্‌সের তাড়া, তখন তা কতকটা মানলেও একেবারে তা একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে পারব না। অনেকানেক কারণের মধ্যে আর্টের একটি প্রধান কারণ,—এমন কি হয়ত, প্রধানতম কারণ, অচেতন যৌনকামনা এও নাহয় মানব। আর্ট মূলতঃ unconscious-এর সৃষ্টি, এ কথাও আমি বহুলাংশে স্বীকার করতে পারি, যদিও conscious element (মনে রাখতে হবে যে, আপাত দৃষ্টিতে যা conscious, মনোবিজ্ঞানের মতে, আসলে তা-ও unconscious-এরই ছায়া) সে সৃষ্টি অনেকাংশে সাজায় গুছায়। কিন্তু এ আনকনশাস হচ্ছে যা রহস্যময়, যার স্বরূপ in spite of psycho-analysis অনধিগত, যাতে হয়ত ধর্মের মৌলিক প্রেরণা রয়েছে (যেমন য়ুঙ্গ এখন বলতে শুরু করেছেন), যাতে হয়ত মানবসত্তার মূলগত আত্মপ্রকাশাকাঙ্ক্ষা নিহিত রয়েছে (যেমন Adler বলেন : মানবের মূল কামনা হচ্ছে inferiority থেকে মুক্তি, will to power, aggression শক্তির সাধনা) এবং যাতে এই সকলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ফ্রয়েডীয় নানারূপ যৌনাকাঙ্ক্ষা। সেই mysterious অচৈতন্য প্রবাহ থেকে আর্ট জন্ম নেয়, কামনার সরোবরে, আত্মপ্রকাশের তাগিদে, অধ্যাত্মবোধের আলোক-সম্পাতে। শুধু sex impulse-এর জল ঘুলিয়ে তার জন্ম-হেতু নির্ধারণ করা যায় না,—যদিও সে জল অগাধ গভীর, কালো এবং কুটিলাবর্ত।

আমার মনে হয়, মানুষ জীবনের তাগিদে আর্ট গড়ে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায় এই যে আর্ট হচ্ছে মানুষের কল্পলোক, যেমন রিলিজিয়ন-ও তার কল্পলোক, যেমন এথিক্‌স-ও কতকটা তার কল্পলোকের স্বপ্ন। এ কল্পলোক গড়বার প্রেরণা তার জীবনগত, তার প্রকৃতিগত। এপর্যন্ত হয়ত সবাই মানবেন, মনোবৈজ্ঞানিকরাও আপত্তি করবেন না। মনোবৈজ্ঞানিক অতঃপর

বলবেন যে, এ কল্পলোক সে গড়তে বাধ্য হয় কারণ এই সংসার এমন কঠিন, নিষ্ঠুর বলে। জীবন এমনি একটা বিষম উপদ্রব যে, তাকে মেনে নিতে মানুষের ভয়ানক বেগ পেতে হয়। তার অচেতন মন সংসার-ধর্মের, সভ্যতার ও সমাজের (যত আদিম সমাজই হোক) নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয়ে মুক্তির পথ খুঁজে ফেরে। সচেতন কড়া মনের পাহারায় সে তো আর নিজের স্বরূপে বাহ্যতঃ প্রকট হতে পারে না। তখন কল্পলোকের স্বপ্ন হয়ে সে আপনার প্রকাশের পথ বের করে নেয়। এই art is wish-fulfilment in the region of phantasy—এই হল এদিকের বক্তব্য, এই মনো-বৈজ্ঞানিকের কথা। ফ্রয়েডীয়রা বলবেন যে, super-ego-র (বিবেকের ?) হুকুম খেটে ego (বা সচেতন মন) শ্রান্ত, হয়রান। id একেবারেই গভীর তমোন্ধকারে নিক্ষিপ্ত। সেখান থেকে id নানা ছলে ছাড়া পায়, মানুষও তার বহুরূপী বেশ দেখে কতকটা শ্রান্তি বিনোদন করে ; অথচ ঠিক তার নগ্নরূপে তাকে দেখে না বলে মনে করে id সেই অন্ধকূপেই asphyxed হয়ে গতাসু হয়েছে। তাই art, religion প্রভৃতির ছদ্মবেশী impulse-এ super-ego বা ego আপত্তি করে না।

এডলারীদল কি বলবেন জানিনে, হয়ত এরূপ কিছু ঃ—মানুষ চায় বাঁচতে। প্রথমাবধিই কঠিন জীবন-সংগ্রামে নিজের অসহায়ত্ব ও দুর্বলত্ব বুঝে বাঁচার বাসনায় মানুষ কেবলি নিজের শক্তিকে জাহির করতে চায়। কার কি ধাত অবচেতন শৈশবে স্থির হয়ে যায় (কিন্তু কিভাবে স্থির হয় ? পরিমণ্ডলের দ্বারা, বংশানুক্রমের দ্বারা, না নিতান্তই নিজের দৈহিক রক্তের গুণাগুণের দ্বারা ? আমি ত মনে করি, এভাবেই মানুষের জীবন নির্ধারিত হয়, heredity, environment ও actual physique যেমন মাথাধরা, ভালো হজম, নাড়ীর ধাত ইত্যাদি)। যাক্‌গে, অবচেতন শৈশবেই স্থির হতে থাকে কোন্ দিকে কি লক্ষ্য কোন্ মানুষ আয়ত্ত

করতে চাইবে। তারপর জীবনে কেউ নিজেকে জাহির করে মুসোলিনী হয়ে, কেউ রবীন্দ্রনাথ হয়ে। আর্টিস্ট জাতের মধ্যে যে কঠিন ঈর্ষা-বিদ্বেষ দেখা যায় আর তার চেয়ে-ও বেশী পরিমাণে যেমন স্তুতি-লোলুপতা দেখা যায়, তাতে তো এইরূপ 'এডলারীয়' ধারণাকেই সত্য মনে হয়। (কিন্তু কোন্ লাইনেই বা নেই ঈর্ষা-বিদ্বেষ, যশোলিপ্সা ইত্যাদি? 'স্বদেশীদের' মধ্যেই কি তা কম?) তবু নির্ভাজ 'এডলারী' তত্ত্বটাই বা মানি কেন? 'আত্ম-প্রকাশ' আর্টের একটা মূল কারণ। নিশ্চয়ই, কিন্তু আর্টিস্ট জাত thwarted sex-impulse-এর কান্না কাঁদেন, ফ্রয়েডীয়দের এই কথাটা-ও তো আর্টিস্টদের রকম-সকম দেখলে মিথ্যা বলতে পারি না। আবার এও তো মনে হয়—আর্ট এতদতিরিক্ত-ও কোনো একটা urge-এর ফল। মূলতঃ প্রাণধর্ম—প্রাণ এব এজতি (যেমন প্রাণধর্ম—ঐ sex-impulse, যেমন প্রাণধর্ম ঐ আত্মশক্তিবাদ, যেমন প্রাণধর্ম Jung-এর মতে অধ্যাত্মচেতনা) প্রাণ বিকশিত হয়। আর আর্ট তার প্রকট আত্মবিকাশের প্রয়াস—ভাবের জগতে, যে ভাব আবার কর্মে রূপ নেবে, 'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'—এই হল মানুষের ইতিহাস, একথা তো নিতান্ত বাজে নয়। মোটের উপর আমি কোনোরূপ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হতে পারব না। বিষম eclectic, অথবা দ্বন্দ্ব সমন্বতি বা ডায়েলেক্‌টিক্‌স-এর অনুসন্ধানী?

পুঃ যা নিয়ে এত কথা সেই প্রবন্ধটি পড়তে পেলাম—এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রের কৃপায়। যা মনে মনে জল্পনা করেছি তাই-ই,—সে-সব পুরাতন মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডীয় সূত্রই তাঁর গ্রাহ্য। তবে, লিপিকুশলতা সুন্দর। যতদূর বুঝেছি তাঁর প্রতিপাদ্য এই যে: (১) প্রথমতঃ আর্টের প্রেরণা হচ্ছে বাল্যের নিরুদ্ধ anal-eroticism-এর ফল।—আমরাও তো বরাবরই বলি emotion জিনিসটা আদ্যন্তই motion-এর পরিণতি। 'আবেগ' ও 'বেগ'

একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। একটা কথা মনে পড়ল, বৎসর নয় পূর্বে দাদা তাঁর মনোবিকলন প্রবন্ধ আমাকে টুকতে বললে, আমি তা এড়িয়ে যাই এই বলে যে, 'ওসব গুহ্যতান্ত্রিক জিনিস—আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা হবে।' ডাক্তারবাবু (গিরীন্দ্র-শেখর বসু) শুনে আমার 'গুহ্যতান্ত্রিক' আখ্যা বা বিশেষণটি খুব খাঁটি বলে মেনে নিয়েছিলেন। তখনো অবশ্য আমি এই আখ্যা সম্পূর্ণ বুঝে ব্যবহার করিনি—হয়ত তা সেই unconscious-এরই ফল কিন্তু কথাটা কি আশ্চর্য রকমের appropriate। এই ত ভাবাবেগের তত্ত্ব। মনোবিজ্ঞানের মতে আর্টের দ্বিতীয় সূত্র হবে (২) তার subject-matter-এর তত্ত্ব। এখানে Oedipius compex-এর রাজত্ব। Theme নির্ণীত হয় ঐ জিনিসটির দৌলতে। বলা বাহুল্য, গ্রন্থিটি ঘটবে অজান্তে, আর রূপকের মারফৎ হবে তার প্রকাশ। (৩) আর্টের তৃতীয়ও একটা সূত্র আছে, তাতে করে আর্টের 'আঙ্গিক' (কথাটা বিশেষ লক্ষণীয়) বা প্রমাণের দিক অর্থাৎ relational element-এর তত্ত্ব বুঝা যায়। চোখে কোন্ জিনিস মনে হয় সু-সীম? যাতে দেহের অঙ্গের কথা মনে পড়ে; এবং এই দেহের, নিজ দেহের ছায়া মনে করিয়ে দেয়। স্ত্রী সুন্দরী কেন? তার সঙ্গে নিজেকে 'এক-প্রাণ এক-টিকিট' অর্থাৎ identify করতে পেরেছি বলে। উপনিষদের বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, 'স্ত্রী স্ত্রী-বলেই যে প্রিয় হন তা নয়, আত্মার জন্য তিনি প্রিয় হন।' ব্যাচারী! সামান্য একটুকুর জন্য ভুল করে ব্রহ্মবিদ্ হয়েছেন। ভুলটুকু না করলেই হতে পারতেন মনোবিদ্ বা যৌনবিদ্। স্ত্রী-বলেই কি আর স্ত্রী প্রিয়? তিনি প্রিয় থেকে প্রিয়া হয়ে দাঁড়ান কি সাধে? আত্মচ্ছায়া বলে (আত্মার ছায়া নয়)। অর্থাৎ মানুষ মূলতঃ 'স্বরাট' এবং 'স্বকাম', সেই উপনিষদেরই উক্তি; —কিন্তু ব্যাচারীরা কি জানতেন কথা দুটোর ব্যঙ্গার্থ? বোধ হয় বুঝেছিলেন, প্রমাণ অদ্বৈতবাদ। যে অদ্বৈতবাদ 'সোহং' বলে

গ্যাঁট হয়ে বসত সে হচ্ছে auto-eroticism বা narcissism-এর তাত্ত্বিক রূপ। যাঁদের narcissistic tendencies বা 'স্বরতিবাসনা' নিরুদ্ধ (repressed) হয়নি—(repressed হলে তো তিনি symbol ব্যবহার করে আর্টে নিজেকে প্রকাশ করবেন)—তাঁদের কাছে আর রূপকের (image) বিলাস ভালো লাগে না, তাঁরা চান abstract thought. আর্টের concrete image-এর মায়ালোক ছেড়ে এসব unrepressed narcissist লোকেরা (সন্ধানী বাতিক, peeping tendency, যদি তাঁদের আবার কপালে জোটে) হয়ে উঠেন ব্যোম ভোলানাথ অর্থাৎ তত্ত্বান্বেষী দার্শনিক। (সেই auto-eroticism-এরই সূত্র হয়ত দেখতে পাই সোহং-এ, দেখতে পাই 'স্বরাট', 'স্বকাম' প্রভৃতি অসাবধানী কথায়। এসব অবশ্য আমার আনাড়ীর corollary drawn from the above premises)। কিন্তু দাঁড়াল কি ?—

বাল্য বয়সে যাঁর 'মলমূত্র-ঘটিত' নিরোধ-যোগ (চিত্তবৃত্তি নিরোধশ্চ যোগঃ; —আর সেই মলমূত্র নিরোধশ্চ আর্টঃ) সার্থক হয়েছে পরবর্তী কালে তাঁর নিরুদ্ধ স্বদেহ-প্রীতি ও অজ্ঞাত গুরু-কল্প-গমন কামনা-গ্রন্থি তাকে আর্টিস্টে পরিণত করবে। তারই ফলে বেরুবে হ্যামলেট, বেরুবে বিটোফেনের 'নাইন্থ সিম্ফনি' (যা আমি শুনিনি); বেরুবে অজন্তার চিত্রাবলী, এলিফেণ্টার ত্রিমূর্তি আর তাজমহল। অলমতিবিস্তারেণ।

প্রগতির গতি

কার বাড়ির আবহাওয়া কতটা রক্ষণশীল কিংবা উদার এই থেকে সকালবেলার আড্ডা শুরু হল—পড়াশুনা বাদ গেল। জানা গেল এখনো বিক্রমপুরের 'সুসভ্য' ব্রাহ্মণ-সমাজে গোঁড়ামির গোড়া আল্‌গা হয়নি। মুন্সীগঞ্জের কালীমন্দির নিয়ে 'রক্ষাবাদী'র দল সত্যাগ্রহীদের উপর খড়্গহস্ত, নিজ নিজ পুত্রদের অনশনব্রতে ও পুত্রের মাতাদের 'হায়! হায়!' রবে, সে কালীমন্দিরে বাধ্য হয়ে সর্বজাতের প্রবেশাধিকার 'রক্ষাবাদীরা' স্বীকার করেছেন; সত্যাগ্রহের ফলে যা হয়নি, পুত্র ও গৃহিণীদের অত্যাচারে তা হয়েছে —কিন্তু change of heart তেমনি সুদূরই রয়েছে। তাই কর্তারা বিক্ষুব্ধ চিত্তে নিজ গৃহে থাকেন, সে কালীবাড়ির ছায়া মাড়ান না। গৃহিণীরা পার্শ্ব দিয়ে যাবার সময়ে কপালে হাত ছুঁয়ে সারেন, মন্দিরে প্রণাম করতে যান না, "সে-ই কালী তো আর নেই—এখন যে এ চাঁড়ালের কালী!"

বাবার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। তিনি পরিহাস করে আমাদের নাপিত কৈলাসকে বলতেন: 'তুই যেমন কৈলাস আমাকে কামাস্, তোর মনসাও তেমন আমার মনসাকে কামায়—কামায় না? আমার সরস্বতীর কাছে আমি দিই পুঁথিপত্র তোর সরস্বতীর কাছে তুই দিস নরুন্ কাঁচি—আমার সরস্বতীকে সে কামাবে বলে। তাই নারে?' 'চাঁড়ালের কালী'র বাড়িতে জল চল নেই—এটা মুন্সীগঞ্জের কর্তারা খাঁটি বুঝেছেন। কর্তাদের ছেলেরা হয়েছে 'গুণ্ডা' —না মানে ধর্ম-জাত, না মানে আচার-বিচার। তাই চটে গিয়ে বাড়িতে হুকুম হল, 'গুণ্ডাটা যে ঘরে যায় সে ঘরে জল থাকবে

না।' রান্নাঘরে ছেলের প্রবেশ নিষিদ্ধ, উঠানে তাকে দিতে হবে খাবার। কয়দিন চলল তাই—ছেলের আপত্তি কি? কিন্তু ছেলের মায়ের অসহ্য হল। 'ওকি বাইরের মানুষ? আমার পেটের ছেলে'? অতএব, আবার চোখের জলের জিত হল। পিতা হারলেন কিন্তু সর্বক্ষণ মুখে তাঁর খেদোক্তি 'গেল-গেল'। একটা নূতন ব্যবস্থা করে কোনোরূপে এবার নিজের ধর্মজ্ঞানকে কর্তা ঠাণ্ডা করলেন—ছেলের সঙ্গে বাক্যালাপ তিনি একেবারে বন্ধ করে দিলেন। ছেলের পক্ষে লাভই হল—'বাক্যালাপের' অর্থ তো গালাগাল।

এসব শুনতে শুনতে একটি যুবক বললেন, 'এখনো কি সত্যি সত্যি এমনিতর গোঁড়ামি আছে?' এ-যুবকটির একটু ইতিহাস আছে—তা জানা দরকার; না জেনে আমি একদিন প্রায় অপ্রস্তুত হচ্ছিলাম।. ওঁরা তিন পুরুষে ব্রাহ্ম। ওঁর নিজেরও দীক্ষা হয়েছে শৈশবে। জাতে ওঁরা উচ্চবর্ণ, কাজেই জাতের পীড়নে ওঁর ঠাকুর্দা ব্রাহ্ম হননি, নিঃসন্দেহে। এপর্যন্ত না জেনেই আমি একদিন বল্‌ছিলাম ঃ ব্রাহ্মদের উৎসব অর্থ—খিচুড়ি। ব্রাহ্মের বাড়িতে কখনো নিমন্ত্রণ খেয়েছেন? সব 'পরিমিত' ও 'নিয়মিত'—হিন্দুরা যাকে বলবে 'মুখজোখা'। —হিন্দুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণের মধ্যে যে 'ঢালাও' ভাব আছে ওটা তাঁদের কাছে একটা অভাবনীয় ব্যাপার। অভাবনীয় থেকেও বেশী ওঁরা মনে করেন—তা' অন্যায়। কারণ, ঠিক আচরণ শোভনতা—অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় ভদ্রতা বাঁচানো যেমন ব্রাহ্মসমাজের একটি মটো, ও-সমাজের দ্বিতীয় 'আদেশ' ইকোনমি—মিতব্যয়িতা—যে করে হোক টাকা বাঁচানো। হিন্দুবাড়ির নিমন্ত্রণ অর্থ যদৃচ্ছা নষ্ট, আহূত অপেক্ষা রবাহূতের ভিড় এবং তারও অপেক্ষা বেশী ভিড় গাঁয়ের কুকুর-শেয়ালের। অপব্যয় বটে, কিন্তু অপব্যয় ও তো জীবন-প্রাচুর্যেরই একটা লক্ষণ। ব্রাহ্মের সবই হল পরিমিত,—পরিমিত প্রার্থনা, পরিমিত চোখ বোঁজা, পরিমিত শিষ্টাচার, সামাজিকতা, পরিমিত হাসি-কান্না, খাদ্য-

পানীয় এবং এমন কি পরিমিত প্রেম পর্যন্ত। এই জন্যই অপরিমিতের পথিক প্রাচুর্যের উপাসক চিত্তরঞ্জন বিদ্রোহ করে বসলেন ও-সমাজের বিরুদ্ধে। তাঁর 'Passionate prodigality of soul' প্রাণোন্মাদনা, কিছুতেই ব্রাহ্ম canons বরদাস্ত করতে পারলে না। বেশ জমে উঠছিল এই থীসিসটা কিন্তু হঠাৎ জানলাম এই শ্রোতা যুবকটি ব্রাহ্ম। নিজের চাপল্যের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। পরে যুবকটির বন্ধু বললেন: 'ওতো এখন আর ব্রাহ্ম নেই—আর ওর মা ওকে কালীবাড়িতেও নমস্কার করিয়ে ছাড়েন।' তবু কেমন সঙ্কোচ ছিল। যুবকটির সঙ্গেই আলাপে তা ঘুচে গেল—ওঁর বোনের বিয়ে হিন্দুমতে দেওয়ায় সমাজ থেকে ওঁদের নিমন্ত্রণ-পত্রও বন্ধ হয়ে গেছে। ওঁরা এখন হিন্দুই। আরও সহজ হল আমাদের সম্পর্ক যখন 'ভবঘুরে' যুবকটির বুদ্ধি ও ভাবনার এক-আধটু পরিচয় পেলাম। দেখলাম উনি জীবনযাত্রায় আমাদের মত হিন্দু অর্থাৎ মুর্গীতে রুচিবান—মনে মনে উনি আমাদের মতই হিন্দু অর্থাৎ ধর্ম সম্পর্কেও উদাসীন, এক কথায় শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক। এই যুবকটি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের দেখে শুনে বোধ হয় ভেবেছিলেন, সমস্ত হিন্দু সমাজটাই ওরকম 'ভদ্র' হয়ে গেছে, আচার-বিচারের বাঁধন তাতে শিথিল হয়েছে। তাই আমি বললাম: "বিশেষ অদল-বদল হয়নি। যাদের দেখেন progressive, যেই গৃহের দায়িত্ব কাঁধে পড়ে, অমনি তারা দায়িত্বজ্ঞানওয়ালা সামাজিক মানুষ হল। তখন তারাই আওড়ায় পিতাদের বুলি। যেমন মুসলমান যুবকেরা—যতদিন কলেজে পড়ে বেশ liberal nationalist। যেই উকিল হল অমনি বেশ orthodox ও communalist। হিন্দু যুবকেরাও অনেকটা তাই। যথা হিন্দু তথা মুসলমান।"

উদাহরণ তখনি জুটতে লাগল। কেউ বললেন, আমার দাদা, স্টীমারে মুর্গী খাওয়া তিনিই আমাকে শিখিয়েছেন, এখন মন্ত্র

নিয়েছেন, স্টীমারে জলটুকুও খান না। বলেন, আমার ছেলেমেয়ে আছে, সমাজে একটা কথা উঠলে ইত্যাদি। কেউ বললেন, আমার সেজদা শনি পূজার ঘটে লাথি মেরে ভেঙে দিলেন। তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। বুক ফুলিয়ে চলতেন, তোয়াক্কা নেই কাউকে, শনিই কি আর রবিই কি? এখন আমাকে লেখেন চিঠি—দেখবেন তার ভাষা—"ভগবানের চরণে ভরসা রেখো, তিনিই ভালোমন্দের শেষ নিয়ন্তা ইত্যাদি।" আমারও জমা উদাহরণ আছে আমার পরিবারের কথা।—আমার শৈশবে-বাল্যে যাঁকে দেখেছি ধর্মাধর্মের ধার ধারেন না, এখন তাঁরই মুখে শুনি তাঁর স্ত্রী ধ্যানে ও যোগে খুব অগ্রসর হয়েছেন (অবশ্য তাঁর স্ত্রীটি ছাড়া অন্য কারো স্ত্রী সেরূপ হতে পারেন একথা তিনি মানবেন কিনা তা বলা দুঃসাধ্য।) এই যোগশক্তিময়ী নাকি অনেক জিনিস আসনে বসে দেখতে পান —অন্তত, সত্য তিনি গোপন করে রাখতে চাইলেও চুপি-চুপি স্বীকার করলেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে। লোককে মোটেই এসব নিগূঢ় সত্য তিনি জানাতে অনিচ্ছুক—শুধু আসনেই তাঁর দৃষ্টি খুলে যায় না, সূতিকা শয়নেও যখন তিনি শায়িতা, তখন তাঁর নবজাত শিশুর মুখে শুনা যায় 'ওঁ ওঁ'। কিন্তু আমার বিশ্বাসপরায়ণ এই আত্মীয়টির কথা বলে আর লাভ কি? ওটা পৃথিবীরই ধরন। তবে পশ্চিম অঞ্চলে রোগশয্যায় পড়লে মানুষ ভগবদ্‌বিশ্বাসী হয়, এদেশে 'ফুলশয্যায়' ভগবানের সাক্ষাৎ ঘটে। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন: মূত্রে যেই চিনি দেখা দেয় অমনি মনে দেখা দেয় ভগবান। ইনস্যুলিন আবিষ্কার তখনো হয়নি। আমাদের দেশে কিসে কি দেখলে এবম্বিধ ভগবৎকৃপা ঘটে? স্ত্রীর ভুজবন্ধনে? কন্যার মুখ দেখে কন্যাদায়ের আশঙ্কায়? না, টাকার খোঁজ পেয়ে; থাকগে সে অমীমাংসিত প্রশ্ন। যেমন করে আজকের আলীগড়ী ছেলেরা—যাঁরা সেদিন প্রস্তাব পাস করলেন যে, 'ভারতীয় স্বাধীনতার সমরে বৈরিতা করে মুসলমান-জাত ভারতবর্ষে থাকবার অধিকার হারিয়েছে', তাঁরাই

পাঁচ বৎসর পরে কাউন্সিলে, মিউনিসিপ্যালিটিতে, জেলাবোর্ডে বলবেন communal representation চাই, আমরা Muslim first, Indian next ; তেমনি পাঁচ বছর পরে কি এই আমরাই কেউ কেউ বলব না—'সমাজ আছে, গুরু-পুরুত আছে, অন্তত বৎসরের দুর্গোৎসবটা না থাকলে যে সমস্ত নিরানন্দ হয়ে যাবে। তাছাড়া ভগবান তো আছেন, আর হিন্দু আচার-বিচারের কিছু কিছু বাদ যেতে পারে, কিন্তু জানোই তো মোটের উপর হিন্দু রীতিনীতি সায়েণ্টিফিক।'

পাঁচ বছরের জন্যে অপেক্ষা করতে হ'ল না, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে কথা এসে গেল। তার পূর্বে আমরা radical-এর দল আলোচনা করছিলাম ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্কে—কেমন করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ব্রাহ্মরা হিন্দু হলেন, রামানন্দবাবু হলেন হিন্দু, রবীন্দ্রনাথও বল্‌লেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরাতন লেখা 'ব্রাহ্ম-হিন্দু কি অহিন্দু', আর রবীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' প্রবন্ধেই তো সে-সব কথা রয়েছে—সেকি এমনি টিকি-নামাবলী মার্কা হিন্দুত্ব ?) 'ব্রাহ্ম কি হিন্দু নয়' ? যাঁরা রামানন্দবাবুকে জানেন না, তাঁরা মনে করেন যে, তাঁর 'হিন্দু' হওয়া বুঝি একটা অমনিতর stunt বা 'ঠেলার নামে বাবাজি'। কিন্তু পাঠকপাড়ার সেই চাটুজ্জে মশায় যে মৃত্যুহীন হিন্দুত্বের ও প্রাণময় হিন্দুসভ্যতার চিরদিনই উপাসক, যেমন তিনি ব্রহ্ম-উপাসক, না বুঝবে এই হিন্দুরা, না বুঝবে বই-এর দোকানের সেই অসহিষ্ণু মুসলিম যুবক যাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আমার একদিন তর্ক হয়েছিল বিষম। থাক্ আমাদের কে একজন বললেন, 'দাঙ্গার বাজারে কে এক মেয়ে লিখেছিলেন—আমরা ব্রাহ্ম, আমরা হিন্দু হব কেন ?' আমি বললাম, জানিনা সে বিদুষী কে। তবে একজন বিদুষীর কথা শুনেছি তাঁর পক্ষে সেটা ছিল আইনের প্যাঁচ এড়াবার জন্য। 'ব্রাহ্ম হিন্দু' হ'লে ভদ্রমহিলা সম্পত্তি হারান। হিন্দু-আইনের তাড়নায় কেউ-কেউ হিন্দুত্বের সঙ্গেও এভাবে

divorce পাকা করে নেয়, প্রয়োজনবশে। এ বিষয়ে গল্পের অভাব নেই। তাই আড্ডা জমল! ঘুরে আবার ব্রাহ্মদের কথা উঠে পড়ল।—ব্রাহ্ম যুবকটি কথা বেশী না বলেও তাতে সহাস্যবদনে যোগ রক্ষা করে গেলেন। রামমোহন রায় কিছুতেই নিজেকে হিন্দু ছাড়া অন্য কিছু বলতে স্বীকৃত হতেন না। আইনের অনেক প্যাঁচ, তা তিনি জানতেন। তা ছাড়া, রামমোহন রায় কি হিন্দু-সমাজের থেকে আলাদা করে একটা নূতন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন? মৃত্যুর পরেও তাঁর গলায় দেখা গিয়েছিল যজ্ঞসূত্র!—জীবনে পাদ্রীদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর কম আগ্রহ ছিল না। হিন্দু অপেক্ষা শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা তাঁর কম তর্কবাণ সহ্য করেননি। অথচ, একথা সত্য যে তিনি ভিন্ন সভা স্থাপন করলেন, ভিন্ন করে তার নিয়মকানুন গড়লেন, একটা ভিন্ন অনুষ্ঠানপত্র প্রণয়ন করে রেখে গেলেন—যাতে আমরা তাঁর সভার গায়ে 'হিন্দু' বা আর অন্য কোন সম্প্রদায়ের টিকেট মারতে না পারি। ওদিকে তাঁর জীবনযাত্রা তখনকার দিনের সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র, অথচ একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর বাড়িতে নিকী নাম্নী খ্যাতনামা নর্তকীর মজুরা হত, সে তখনকার দিনে গোঁড়া সমাজকর্তাদের বাড়িতেও হত। 'ধর্মসভা'য় পরবর্তী কালে ঐ বংশের যিনি সভাপতিত্ব করতেন তিনি মুসলমান বাঈজীকে বিয়ে করবার জন্য ত্বকচ্ছেদন করে প্রকাশ্যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন,—অন্তত সেকালের সাময়িক পত্রে প্রতিপক্ষ এসব সত্য মিথ্যা কথা উল্লেখ করছে—তবু তিনিই হলেন গোঁড়া ইস্কুলের নেতা। রাজার জীবনযাত্রা তাঁর তুলনায় হিন্দুই ছিল বলতে হবে। কেউ কেউ অবশ্য বলেন মুসলমানীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, বলতেন 'শৈব-বিবাহ'।—সে মতটা ঠিক বৈদিক নয়, কিন্তু সমাজ তাকে একেবারে অস্বীকার করতেও পারে না। মুসলমানীর গর্ভস্থ রামমোহনের পুত্রটির নাম 'সেখবক্স' না 'রাজারাম', না দুই-ই তা নিয়ে একটা তর্ক বেধেছে। এসব কথা হচ্ছিল—একজন বললেন, 'আপনি দেখি

রাজার ব্যাখ্যানে অন্নদাশঙ্করকেও ছাড়িয়ে যান। তিনি ঢাকা হলের (?) রামমোহন সেণ্টিনারীতে সভাপতি হয়ে যা বলেন—শুনে চারুবাবু লাফান (কেন? চারুবাবু কিসে রাজাকে অনুসরণ করেছেন যে, রাজা তাঁর অত বড় 'পীর'?)। ব্রাহ্মদের তো কথাই নেই। অধ্যাপক অঃ রেগে খুন; তাঁর ফার্স্ট ইয়ারের ভগ্নী রেগে আগুন। পরে আবার ভিন্ন সভা ক'রে সে সভাপতির অভিভাষণের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করা হ'ল (আশা করা যায়, বোস্টনের ভস্মরাশি তাতেই ঠাণ্ডা হয়েছে—নইলে কবরে রামমোহন পাশ ফিরে শুতেন)। কিন্তু রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কর মহাশয়ের থেকে আমার ধারণা সংগ্রহ করতে হয়নি। পৌত্তলিকতার বিরোধী রাজা মহাশয়ের idolটি ভাঙা শুরু হয়েছে অনেকদিন পূর্বে। তার প্রথম phase 'নারায়ণ' পত্রে চিত্তরঞ্জন উদ্‌বোধন করেন উনিশ-কুড়ি বছর পুর্বে (১৯১৪-এর কাছাকাছি)। নূতন করে তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি 'প্রবাসী' আপিসেই দেখা দেয়—তাতে ছিলেন একদিকে গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর দিকে অ-গবেষক মোহিতলাল, নীরদ চৌধুরী ও সুগবেষক ডাঃ সুশীলকুমার দে। আমারও রামমোহন রায় পড়া ছিল—মনে একটু তখন লেগেছিল। ওঁরা আমাকে বললেন: ব্রাহ্ম hypnotism হিন্দু যুবকদেরও পেয়েছে—তাই রামমোহন রায় দি ম্যান আর নেই, রামমোহন দি মিথই সর্বত্র পুজিত। রামমোহন দি ম্যান কী? কী নয় তা-ই তাঁরা প্রমাণ করতে বসলেন: (১) তাঁর তিব্বতযাত্রামূলক কিম্বদন্তী একটি 'গাঁজা'—অটোবায়োগ্রাফিক স্কেচ-এ তা আছে, অন্য কোথাও নেই। সেই সমুদয় 'স্কেচটি' মিস্ কলেটের (?) 'আবিষ্কার'। (২) তাঁর ইংরেজী লেখার কোন্‌টি তাঁর কোন্‌টি অ্যাডামের তা জেনে তাঁকে তারিফ করা দরকার। (৩) সাত-আট টাকা মাইনেয় তিনি রঙ্গপুরে সেরেস্তাদার ছিলেন—কলকাতা ফিরেন বিপুল বৈভব নিয়ে। সেকালে সেরেস্তাদাররা নাকি কমিশন পেতেন, তাতে সন্দেহ আছে। সন্দেহ নেই যে এ-কমিশন—both commission and omi-

ssion-এ। (৪) তাঁর মুসলমানী স্ত্রী ও তৎ গর্ভজাত পুত্রের কথা শুনলে ব্রাহ্মরা নিজের নাম ভুলে যান। কিন্তু রামমোহন তাতে সঙ্কুচিত হতেন না। সেদিনে ওসব আভিজাত্যের অঙ্গ। (৫) যে মদের নামে ব্রাহ্মরা নাক সিঁটকান, সে মদ রাজা খেতেন—তা ব্রাহ্মরাও মানেন। (৬) রামমোহন সাধকও ন'ন, saint-ও ন'ন, devotional typeই ন'ন—সেরূপ ছিলেন কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ও আংশিকভাবে দেবেন্দ্রনাথ! (৭) রামমোহন বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ কেউ ন'ন, তাঁর পূর্বে ও পরে চমৎকার বাঙলা লেখা হয়েছে। অথচ, রামমোহনের বাঙলা ও পাদ্রীর বাঙলা দু'য়েরই মিশান, একেবারে অপাঠ্য। রাম-মোহন তবে কী ছিলেন? (১) জবরদস্ত তার্কিক, dialectician; (২) a great genius,—সমস্ত reforms-এর অগ্রদূত। শক্তিশালী বিরাট পুরুষ—একটা আস্ত পাঁঠা খেতে পারতেন, প্রকাণ্ড ছিল তাঁর দেহ (মাথার শামলাটা আর কারও মাথায় পরা চলে না—এত বড়)। প্রচুর ছিল তাঁর মনের সাহস। সমকালবর্তীদের জগতে তিনি তাই giant—কামিনী-কাঞ্চন দুয়েতেই ছিল যৎপরোনাস্তি অনুরক্তি। কিন্তু ধর্মসংস্থাপক হবার কল্পনা কি তাঁর ছিল? বলা দুঃসাধ্য। তাঁর না থাকলেও পরবর্তিকালীরা তাঁর উপর সেই দায়িত্ব ও গৌরব আরোপ না করে ছাড়বেন না। ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতার বিরোধীই শুধু ন'ন, পয়গম্বরপন্থী, গাজী হলেই হয়।

আমার নিজের বিশ্বাস—রামমোহনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ, তাঁর দূরদৃষ্টির ও গভীরদৃষ্টির সাক্ষ্য এই যে, তিনি সর্বাগ্রে বুঝেছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ভারতবর্ষের চাই। ওইখানেই তাঁর অন্য সব মহত্ত্বের বীজ গোপন আছে। পড়ুক ছেলেরা দেবভাষা, চিরদিনই টিকি নড়বে, নস্যি ওড়াবে আর কচ্ছ ঝেড়ে তর্ক করবে পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র। পড়ুক তারা ইংরেজী—অমনি তার পিছনে আসবে নিরাকার একেশ্বরবাদ, 'সতী', কৌলীন্য, 'বহু বিবাহ' ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন, খসে যাবে পাঁজির পাতা, জাতির পাঁতি, আসবে

যুক্তিবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পোলিটিক্যাল স্বাধীনতা। কথাটা ইয়ংবেঙ্গল প্রমাণ করে দিয়েছে। এই সত্যটা রাজা প্রথম দেখেন—and that is his any title to fame and esteem. আজ আমাকেও সবাই বল্‌বে Rajar detractor, কারণ যা রাজা নন তা আমি স্পষ্ট করেই বলি কিন্তু এ-ও ভুলিনি, সে লোকটা পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজের পরিমিত জীবনযাত্রার আদর্শ মানবার জন্য জন্মাননি—তিনি প্রবল পুরুষ, দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিত, অসাধারণ তেজস্বী,—সাহেব চেয়ারে বসতে বলেননি বলে তাঁর জীবনের প্রথম চাকরিতে তখনই তিনি ইস্তফা দেন। পাল্কিতে যাওয়ার সময় সাহেবকে নেটিব হয়েও তোয়াক্কা করতেন না। স্বাধীন দেশের পতাকা দেখলে তাঁর প্রাণ নাচ্‌ত, ১৮২৯-এর বিলাতী রিফর্ম স্কিমের নামে তিনি ক্ষেপে উঠেছিলেন। সেকালের ধর্মধ্বজীদের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতেন—'অভীঃ'। কিন্তু সাধনা devotion? সে রামমোহনের নয়। ধর্মসংস্থাপক—সে তাঁর ধাৎ নয়। Sainthood? বিষয়ী রামমোহন first and last worldly. তবে বাঙালীত্বের এই কৃষ্ণপক্ষে রাজা রামমোহনকে myth হিসাবে রক্ষা করাই আমাদের বাঙালীদের interest—অতএব, থাকুন তিনি সকলের শীর্ষদেশে 'নব যুগের অগ্রদূত' 'যুগ সংস্থাপক' রাজা।

আমাদের তর্ক তখন গেল এ পথে—ব্রাহ্ম সমাজ এখন কোথায়? একজন বল্লেন: সমাজ-মন্দিরে এক বৃদ্ধ বক্তা দুঃখের সঙ্গে বল্‌ছিলেন, আজ আমাদের দিন গেছে, সমাজের অবস্থা সঙ্গীন, সূর্য বুঝি ডুবুডুবু। শুনে প্রৌঢ় ও যুবকের দলে বিষম উত্তেজনা, চাপা কান্না, চিত্ত বিক্ষোভ। একজন ৭।৮ বছরের একটি মেয়েকে উঁচু করে তুলে ধরে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্রাহ্মধর্ম শেষ হচ্ছে। এদের তা'হলে কি গতি হবে?—সত্যিইত! আমি হেসে বললাম: গতি আছে—সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ তীর ডিঙিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল তীরটাই তার যত বাধা। এল তীর ডিঙিয়ে। এখন চারদিকে তীরের বেড়া তুলে সে ঢেউ হয়েছে cess pool. ওদিকে মহাসমুদ্রের

অন্ত ঢেউ দূর-দূরান্তরের সৈকতে-সৈকতে করতালি দিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। এখন উপায়? cess pool যদি সমুদ্রের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারে তবেই নিজে রক্ষা পাবে—সমুদ্রের সঙ্গে পারাপারে তার গতি হবে নির্ভীক।—হিন্দু ছেলেরা কথাটা শুনে খুশী। গল্পটা আরো জম্‌ল—আমি যখন বললাম সেবার বৃদ্ধ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ও একজন ব্রাহ্মপ্রচারক মহাশয়ের মুখে যে ব্রাহ্মধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত বক্তৃতা শুনেছিলাম সেই কথা। দূর পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম সম্মেলন করে দলটি একটি ছোট শহরের (নোয়াখালি,) চড়ায় এসে ঠেকেছেন—প্রচারার্থ। শহরে ব্রাহ্ম নেই একটিও—ভরসা একমাত্র আমরা, যাদের ধর্ম নেই। প্রায় অশীতিপর কৃষ্ণকুমার মিত্রের হৃদয়াকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার ব্যবস্থা আমরা করলাম। সভার আয়োজন হল, লোকজন ডেকে জড় করলাম। অন্যতর প্রচারক মহাশয় এখন সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত আত্মা। তাঁর বক্তৃতা যেমন দীর্ঘ তেমনি সারগর্ভ। ব্রাহ্ম ধর্মের মহত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্য বললেন, কেমন আশ্চর্যভাবে এই সত্য ধর্মের আশ্রয়ে ব্রাহ্মরা মৃত্যু বরণ করেন। 'তাই আমার মাতুল ('আমার মাতুল' সংবাদটাও কি ব্রাহ্ম ধর্মের মহত্ত্বসূচক সংবাদ?) প্রাচীন ব্রাহ্ম পণ্ডিত—শেষ শয্যায় শুয়ে দীর্ঘকাল মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন। কি তাঁর অম্লান অপেক্ষা! একটি কাতরোক্তি নেই। আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে একদিন পাশের ঘরে কথা হচ্ছে—রাত্রি অনেক—মামার যে সাড়াশব্দ নেই, কিছু হল নাকি? মামা বল্‌লেন: 'আমি এখনো মরিনি, এখনো বেঁচে আছি।' মৃত্যুর সম্মুখে কি নির্ভীক, নিষ্কাম ভাব—সত্যকারের ব্রাহ্ম ছাড়া কে পারত এমন স্থির থাকতে?" বক্তৃতা শুনে আমাদের চমক লাগ্‌ল—সাকো ভেঞ্জিটির কথা জানতাম, মৃত্যুর মুখোমুখি বৎসরের পর বৎসর বসেছিলেন—একটি চুলও কাঁপেনি। আরো অনেকের কথা জানি, মাত্র কিছুদিন পূর্বেই ভোলানাথ সেনের মুসলমান হত্যাকারীরাও শহীদ হয়েছে। কিন্তু তখন কি জানতাম, তাদের সেই মৃত্যুবরণের

পিছনে ছিল ব্রাহ্মধর্মের এই তেজ ? মনে পড়ল, ইনি সেই ব্রাহ্ম সাধক যিনি পরমহংসদেবকে বলেছেন 'নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব', কারণ তিনি অশ্লীল কথা বলতেন। অশ্লীল কথাটা কি ? শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর উল্লেখ করে বলেছিলেন : 'সে শ্যালী কি আমায় কম ভুগিয়েছে'। শ্যালী, ভগবন, ভগবন,—যদি বা বলতেন, 'ভগ্নী', কিম্বা 'মহিলা'। প্রচারক মহাশয়ের বাগস্ত হলে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। সেই বৃদ্ধ—মনে সে তেজ আছে, কিন্তু দেহ যে জীর্ণ, তেজ ফুটতে গিয়ে আর সুমহৎ রূপ নেয় না, নেয় tragic বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাসের ক্ষুব্ধ করুণ রূপ। গলা ফেটে যায়—তবু তেমন দরাজ হয় না! চোখে হয়ত দীপ্তি ফোটে, কিন্তু শ্বেতায়মান ভ্রূর মধ্যেকার শ্বেতায়মান চোখে তার সন্ধান আর অন্যেরা পায় না! হায় জরা! হায় কৃষ্ণ মিত্র! তবু সে কি খেদোক্তি, কি আর্তনাদ ? "কে বলে ব্রাহ্ম ধর্ম নেই ? আজ ও তা হৃদয়ে শান্তি দিচ্ছে, জ্যোতি দিচ্ছে, আনন্দ দিচ্ছে। কে বলে ব্রাহ্ম সমাজ মুমূর্ষু ? আজও তো নারীর অধিকার খর্বিত, অস্পৃশ্যের মনুষ্যত্ব নির্জিত, নৈতিক অনাচার বর্ধিত।" —আমরা বাড়ি ফিরলাম। পথে বললাম, বুড়ো মরণ কামড় দিতে চান। কিন্তু আহা, দাঁত নেই ব্যাচারীর। ব্রাহ্ম সমাজের দাঁত আর নেই। কিন্তু হিন্দুদের মনে রাখা উচিত, ব্রাহ্ম সমাজ শেষ হচ্ছে,—কারণ তার mission fulfilled—হিন্দু সমাজকে সে ভদ্র করে দিয়ে তবে মরছে। হিন্দুদেরই কৃতজ্ঞ থাকার কথা। বাগবাজার শোভাবাজারের বাড়ির মেয়েরাই হয়ত আজ মিত্র বসু ঘোষ সরকারদের গৃহিণীরূপে এখন স্বামীদের আগ্‌লাবার জন্য বিলাত যান, দ্বিতীয় ভাগের বিদ্যার উপর বিলিতী এটিকেটের পলিশ লাগিয়ে ইংরেজী সামাজিকতার দৈনন্দিন বাজার চমৎকার সমাপ্ত করেন, মা কালীর প্রসাদ ও পানের ডিবে গোপনে চুপ্‌ড়িতে রাখেন এবং প্রয়োজনমত লিপস্টিক-চিত্রিত মুখে নিষিদ্ধ আহার্য পানীয় তুলে নেন। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—কিন্তু রাধাকান্ত দেব কি এজন্য নিমতলা ছেড়ে

উঠে আসবেন? মনে হয় না। এঁরাই কি খুব অন্যায় আদর্শ ধরেছেন? কে বল্‌বে? এই শতাব্দীর উনিশ-বিশেও দেখেছি 'দক্ষিণী ঘরে' ফ্যাশানের আদর্শ জোটাতো থিয়েটারের বাঈজীরা। কর্তারা ঘন ঘন বিলাতে মুখ বদলাতে যান, গিন্নীরা ঘন পর্দার আচ্ছাদনে 'আড়াই-মণী' দেহ নিয়ে মোটর-যোগে আত্মীয় গৃহে আত্মীয়তা রক্ষা করেন। পরেকার চার-পাঁচ বছরে একটু পর্দা ফাঁক হল, মোটর দূরের পাল্লা ধরল। আজ বাঙলা থিয়েটারের বাঈজীদের বদলে ফ্যাশানের আদর্শ দান করছে মার্কিন সিনেমার ও ও ইংরেজী ম্যানিকিনের তন্বঙ্গিনীর দল। উন্নতি না অবনতি? লেখাপড়ার জগতে এখনো দ্বিতীয় ভাগ টিকে আছে বটে, কিন্তু 'ম্যাটরিক—আই এ'-ও আসছি নাকি? অতএব জয়স্তু কৃষ্ণ মিত্র। The Brahmo Samaj is dead. Long live the Brahmoised Hindu Samaj.

আমাদের আড্ডার তরুণ বন্ধুটি বললেন: 'সে তো ঠিকই। তবে আমাদের spiritual আদর্শ একটা আছে। তখনো ছিল, এখনো আছে।' এই রে, the bugbear! প্রাচীন তান্ত্রিক সাধকদের স্পিরিচুয়াল আদর্শের কতকটা আমি দেখেছি, স্পিরিচুয়াল কিছু আমি দেখে থাকলেও মর্ম বুঝিনি। বাবার অনেক আশা ছিল আমি বুঝি বেশ ধর্মনিষ্ঠ ব্রহ্মাণবটু হব। কিন্তু আমি ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে বোধ হয় জন্মান্ধ—spiritual শুনলেই যেন আমার হাসি পায়। তরুণ বন্ধু তর্কে মুখর হয়ে উঠ্‌লেন। একজন টিপ্পনী কেটে আমার উদ্দেশে বল্লেন: কালীঘাটে No God League আছে না? কি করে বোঝাই আমার সে পাট ১৯২২শে শেষ হয়ে গেছে। 'মানব-মঙ্গল মণ্ডলী'র কথা আই-বি'রাও জানেন। আমাদের অনুষ্ঠিত 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তার' সভায় তখন শহর ভেঙে পড়েছিল—কৃষ্ণ মিত্রের সভায় তার সিকি লোকও আসেনি। বাধ্য হয়েই চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছিল, 'আমরা নাস্তিক'। দেখে শুনে সপ্ততিপর এক বৃদ্ধ কেঁদে আকুল:

"আর রক্ষা নেই। ঘরের বউ-ঝি আর থাক্‌বে না—ওরা টেনে বার করবে।' আমরা হেসেই খুন—বুঝলাম সার্থক হয়েছে সভাটা। সে সব কথাশেষ হল। পাঁজি দেখে আজ যখন বারো-তেরো বৎসর পরে অলাবু ভক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে হাসছি—তরুণ বন্ধু বললেন: কিন্তু ওর scientific কারণ আছে। হরি হরি! পঞ্চাশ বৎসর পরেও Huxley শশধর and goose! রামমোহনই বলি, ব্রাহ্ম সমাজই বলি—দেশটা বাবাজী ও আর মাতাজীদের।

শৃঙ্খল ও উচ্ছৃঙ্খল

কথাটা উঠল, অনেক পরে। কিন্তু যে পরিক্রমাপথে এসে সেখানে পৌছালাম তা-ও আমার কাছে মন্দ লাগেনি। গল্প হচ্ছিল—আর্টিস্টরা কি জাতের লোক, বাঙালাদেশের মাসিকপত্রে তাদের ছবি যে ছাপে তাতে তাদের প্রতি সুবিচার হয় কিনা। প্রাসেস্ প্রিন্টিং কি ব্যাপার, এসব ছেড়ে ক্রমে কথা এসে গেল বাঙালাদেশের বর্তমান চিত্রকরদের সম্পর্কে। অমুকের কেমন ভরসা আছে, তমুকের থেকে কি আশা করা চলে; যামিনী রায় সত্যিকারের আর্টিস্ট হয়েও একটা বিশেষ ইডিয়মের চাপে পড়ে যাচ্ছেন কিনা; মুকুল দে'র স্কেচিং কিরূপ, এবং শিল্পীদের কিরূপ কার খেয়ালপনা, কার কিরূপ ব্যবসাদারি। ভাবী আর্টিস্টদের মধ্যে কাকে দেখতে পাব, কাকে আর দেখতে পাব না। "বক্তার নিজেরও আঁকার হাত ছিল কিন্তু তার বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল কঃ বি। সে যখন ছবি প্রথম আঁকত তখন কে জানত ও হবে আর্টিস্ট।"—কঃ জানালেন। "এখন তো দাঁড়িয়ে গেছে—রীতিমত এখন নাম হয়েছে। তবে ওর বেশী সে যাবে না। নাম জিনিসটা একটু trick ও pushএর উপর নির্ভর করে—তা সে পেয়েছে। কিন্তু কঃ বি'র এলেম আর বেশী নেই।" বলে কঃ বি'র অগ্রস্থ বন্ধু বললেন: "ওর শখ হল, সন্ধ্যাবেলা একটু বেশ-বাস করে প্রেম করতে বেরুনো—অবশ্য যত্র-তত্র নয়। আর এতদিনে-ও ঠিক চূড়ান্ত-লোক পেয়েছে কিনা, বলতে পারি না। এ প্রেমটা ছিল একটু হাল্কা, ফুরফুরে। নিবেদন ছিল তেমনিতর কার-ও কাছে যাদের বাড়ি আমিও যেতাম—কিন্তু সে দ্বিতীয়ার নিকটে (দ্বিঃ কিন্তু 'উক্তা'র সহোদরা নয়, কনিষ্ঠা-ও নয়; শুধু সুবিধার জন্য নাম রাখা গেল দ্বিঃ, আর কাজেই যার কাছে আমাদের কঃ বি সান্ধ্যালাপে যেত তার নাম

ঋরি উক্তা—উঃ)। যাক্—উঃ কিন্তু খারাপ নন—দেখতে মোটের উপর সুমুখী আর যুবতী-ও। —হুঁ, ছেলেপুলে কয়েকটি তখনই ছিল বটে, এবং স্বামীও ছিলেন একটি। উঃ মন্দ নয়। তবে কি জানেন, তাঁর একটা শখ তেমনিতর আড্ডায় preside করা যা আপনাদের ফরাসীদেশে মিলে। বোধহয় ফরাসী উপন্যাস-টুপন্যাস পড়েই ঝোঁকটা পেয়ে বসেছিল। মানে, Salonএর অধিনেত্রী হতে চান উঃ। তাই একটু যৌবন-exhibitionist এবং তার চেয়েও বেশী exhibitonist তাঁর 'আর্টিস্টিক soul'-এর। তিনি চান, ছোট-ছোট আর্ট-আরাধকরা তাঁকে ঘিরে বসুক, তাঁকে কেন্দ্র করে তারা জুটুক, খুব বেশী বাড়াবাড়ি না করে নিয়মিত এক আধটি অর্ঘ্য দিক—সন্ধ্যার শান্ত আলোকে মোলায়েম হাসি ও মেদুর কটাক্ষের মধ্যে উঃর শিল্পী-প্রাণ পাক তাঁর প্রাপ্য! কঃ দেখি সাজ-সজ্জা করে বেরুচ্ছে, জিজ্ঞাসা করলাম: কোথায় যাস? একটা লম্বা কাজের ফর্দ দিলে; তার পক্ষে যেমন জরুরী, তেমনি আমার পক্ষে তা দুর্বোধ্য। আমি পিছনে পড়লাম—বুঝতেই পারেন, পাছে চুঁ না খাই—একই বাড়িতে। ঠিক শোনা যাচ্ছিল ওর কোমল ভিজা-ভিজা, কৃপাপ্রার্থী কণ্ঠের মৃদু সাড়া আর উঃর নাতিউচ্চ হাস্য। তবু পরদিন জিজ্ঞাসা করতেই আবার সেই পূর্বদিনের-কথিত কাজের তালিকার পুনরুক্তি করলে, কাল সন্ধ্যায় ওর বড্ড কাজ ছিল। মনে-মনে হাসলুম, সে কার্যতালিকাও কালের তালিকার সঙ্গে ঠিক মিল খায় না। মিথ্যা কথা বলতে পারে জিনিয়াসরা—মনে রাখতে হবে, কবে কোথায় কি বলেছি, না হলে কথার কেল্লা যাবে এক নিমেষে ধসে। সত্য হচ্ছে plain man-এর একমাত্র আশ্রয়। যাক্, কঃকে আমি কিছু বললাম না—হাজার হোক ছেলেমানুষ—আর উঃর ওপরেও আমার তেমন অনাস্থা নেই। কতকগুলো কারণে তাঁকে আমার ভালোই লাগত। একটি শিক্ষিত মেয়ে—মানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ; অতগুলো ছেলেপুলের মা। তখনো

তার স্বামীর রোজগার ছিল সামান্য। রান্নাবান্না করে, ঘরদোর গুছিয়ে, ছেলেপিলেদের তদবির সেরে, নিজের দেহটিকে এমনিভাবে যত্ন করে 'ছিমৃছাম্' করে তুলতেন যাতে তাঁকে প্রশংসাই করতে হয়। তারপর বলেছি, দেখতে সুমুখী এবং যৌবনের উপর মাতৃত্বের জয় বিঘোষিত হয়নি। তাছাড়া, বেশ সপ্রতিভ—এমন মেয়েকে ভালো লাগে সবারই। কিন্তু একবার একটা কারণে আমি চটে গেছলাম। তখনকার দিনে শহরে গেলে তিনি উঠতেন আমার কাজিন কান্তদা'র বাড়ি। কান্তদা'র বয়সটা খুব বেশী নয়, পসার জমেছে। তাঁর বাড়িতে উঃ একা ওঠেন বলে লোকে একটু বাঁকা নজরে হাসে—আমরা-ও হাসি। কিন্তু কান্তদা'র তাতে কিছু যায়, আসে না। উঃ-র-ও না। তবে, এটাও সত্য যে, আমরা একটু মজা পাই তাতে। কারও ক্ষতি নেই। কারণ, কান্তদা'র স্ত্রী কান্ত বউঠান উঃকে খুব আদর করে গ্রহণ করেন, নিজের সখীই মনে করেন; কিছু নটখটি থাকলে বউঠান তা সহ্য করতেন না। তেমন মানুষ বউঠানও নন। যাক, একদিন বিকালে গিয়েছি কান্তদা'র বাড়ি। আমাকে দেখেই উঃ বলে উঠলেন—তিনি সেদিনই দুপুরে এসেছেন—"এই যে বঃ, তোমাকে পাঠালেই তো হয়! চলে যাও না একবার সুঃকে ডাকতে। বলোগে আমি এসেছি—একবারে ডেকে নিয়ে এসো তাকে, বলো আমি বলেছি।" সুঃ ছিল তাঁর সহপাঠী, বন্ধু; তখন নূতন উকীল—চালাক-চতুর ছোকরা। আমি কিন্তু তবু হুকুমটায় একটু অসন্তুষ্ট হয়েছি। এলাম, আর তখনই কিনা বলে ছুটতে দেড় মাইল দূরে সুঃ-বাবুকে ডাকতে। যাক, ভাবলাম, জরুরী কিছু কাজ আছে বুঝি। দাদার মুখেও আপত্তি নেই; বউঠানেরও না। অতএব, চলে গেলাম সুঃএর কাছে। দেরি হল না। বাহন সাইকেল। তাঁরও সাইকেল আছে—খবর শুনে আমার সঙ্গে রথারোহণ করলেন। ফিরে দেখলাম বসবার ঘরটার রূপ ফিরে গেছে—টেবিল, চেয়ার সরানো, খালি মেজে আর শূন্য দেয়াল যেন কার পদপল্লব ও

দেহচ্ছায়ার আলিঙ্গন অপেক্ষা করছে। পাশের ঘরে আমি সুঃ-এর সঙ্গে এসে সবে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—আরাম কেদারা থেকে উঃ লাফিয়ে উঠে বললেন; "এই যে সুঃ এসে গেছো। যাক, বাঁচা গেল।"

"তুমি এলে কখন?"

"ঘণ্টা তিন পূর্বে। কান্তবাবু বলছেন, একটু ড্যান্স দেখতে চান"—সত্যই কান্তদা' বলেছেন কিনা, বুঝতে পারলেম না। তাঁর ভাবটা এরূপ—মন্দ কি? হলে হোক না একটু নৃত্য; তবে তেমন আগ্রহ-ও নেই। ব্যাপারটা যা পূর্বে ঘটেছে তাতে বুঝলাম গরজটা উঃর পক্ষেই একান্ত না হয়ে ওঠে এই আশঙ্কায় গৃহকর্ত্রী—আমার কান্ত বউঠান—বরং একটু মৃদুস্বরে বলছিলেন, "তাই নাকি? খুব ভালো নাচ শিখেছ তুমি উঃ? একবার দেখতে পারলে হত।" কিন্তু দেখতেই বা তিনি না পাবেন কেন? উঃ নিজেই জানাচ্ছেন তাঁর নয়া বিদ্যার সংবাদ; নিজেই তাড়া দিচ্ছেন অন্যদের সে 'শিল্পের আবেদন' উপস্থিত করবার জন্য; নিজেই বললেন, 'অসুবিধা কি? এ ঘরটার আসবাবগুলোতো দু'মিনিটে সরিয়ে নেওয়া যাবে। পার্টনার—তা পার্টনার এখানে কাকে পাওয়া যায়? একটু চলন-সই হলেই আমি তাকে চালিয়ে নিতে পারি। কান্তবাবু পারবেন?' কান্তবাবু উচ্চ হাস্য হাসলেন। উঃ বললেন: 'তাহলে সুঃকে ডাকতে হয়। সুঃ সহজেই শিখে নিতে পারবে। এমনি সময়েই হয়ত সেই বাড়িতে সে অপরাহ্ণে উদয় হয়েছিলাম এই অধম। আর অমনি হয়েছিল সেই হুকুম, 'এই যে বঃ। তা তোমাকে পাঠালেই তো হয়।' আমি ভেবেছিলেন, সুঃকে বুঝি উঃ কোন জরুরী কাজে চায়। এখন শুনে চমকে গেলাম যে ড্যান্স হবে। উঃ বলে চলেছেন, 'কান্তবাবু আমার ড্যান্স দেখতে চান কিনা—কার কাছে বুঝি শুনেছেন আমার ওরিয়েণ্টাল ড্যান্সের কথা,—তাই ওঁর ভারী শখ।'—কান্তদা'র মুখের দিকে তাকিয়ে আমি শখের চিহ্নও দেখতে পেলাম

না। তাতে কি? উঃ বলে চল্লেন: 'কিন্তু পার্টনার পাই কোথা? তোমাকে তাই ডাকালাম, পারবে না? একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখুনি।' আমি বুঝলাম, কেন সুঃ-এর জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা। ছিপ্‌ছিপে চিক্কণ সেই নবঘনশ্যাম ছোকরাকে তিনি জুড়ি করতে চান, আর সে জন্য পাঠিয়েছেন আমাকে তাঁর দূত। আমি বোধহয় তাঁর চোখে পড়িনি। নিতান্তই একটা তুচ্ছ যুবক মাত্র, তাঁর চাই সুঃকে। মুখে আমার একটা কথা ফোটেনি, কিন্তু চোখে বোধহয় ফুটেছিল। অন্ততঃ তাই পড়ে কান্তদা ও বউঠান বললেন, "বঃ এসো, বসো।"

উঃর অবশ্য আমাকে দেখবার সময় ফুরসৎ নেই, হয়ত তেমন আশঙ্কাও তিনি করেন নি। আমার আবার ক্রোধ হবে কি? কান্তদা'র কথায় উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এসে সাইকেল ধরেছি, পিছন থেকে বউঠান ছুটে এলেন ডেকে ডেকে 'বঃ, বঃ'। কিন্তু আমি কি ফিরি? রাগে তখন গা জ্বল্‌ছে। বউঠান এসে হাত ধরে ফেললেন: 'এই বঃ তুমি যে চল্লে?'

'হ্যাঁ, আমার এখনই যেতে হবে।'

'না, রাগ করো না, বসো।'

'সে হয় না।' সাইকেল তুলে নিয়েছি। বউঠান বল্লেন, 'বিশ্রাম করো, জলটল খাও,—কিছু মুখে না দিয়ে তুমি যাবে কি-করে?'

'আজ নয়।'

'না, না, সে কি হয়।'

'হতেই হবে।'

বউঠান তখনো হাত ছাড়েন না—'রাগ করে তুমি যাবে—সে হব না। কিছু অন্তত খেয়ে যাও—আমার কথা শোনো, যা কিছু হয় একটু মুখে দেবে, এসো।'

আমি নড়লাম না, বললাম: 'পরে আসব—কাল, বাড়ির অতিথি নামলে পর।'

আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চললাম, বউঠান ফিরে গেলেন। সে অতিথি একদিন অতিক্রম করে আরও একদিন বেশী ছিলেন; আমিও কিন্তু সে বাড়ি যাইনি। যেদিন উঃ চলে গেছেন জানলাম তার পরদিন যাই। কান্তদা' কিন্তু মোটেই রাগ করলেন না, বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক করেছিস। She has been rightly served." মুখে আমার জন্য একটু স্থির সমর্থন। এর বেশি নয়। কারণ, তার পরেই কিন্তু তিনি প্রসঙ্গান্তরে গেলেন।

এই হল উঃর সঙ্গে আমার চটামটির গোড়ার কারণ। তার পরে যখন আবার দেখা, তখন দ্বিঃর সামনে, কলকাতায়। উঃ নিজ থেকে বল্লেন: "আমার মনে আছে সেদিনকার কথা—তুমি আমাকে খুব 'কাট' করেছিলে। আমার কিন্তু একটুও খেয়াল ছিল না। লক্ষ্য পড়ল তখন, যখন দেখি কান্ত বউঠান তোমায় কি বল্‌ছেন, তুমি কিছুতেই শুন্‌ছ না, পরে তুমি বেশ তেজের সঙ্গে সাইকেল চাপলে। কিন্তু দেখো, বঃ, ইচ্ছা করে তোমাকে আমি slight করিনি!......আর মনে কিছু করো না।......ওরকম হয়ে যায়...... তা এসো এখন, এখন তো we are good friends."

আসলে, উঃরও অনুগ্রহান্বিতা হওয়ার কারণ ছিল,—ইতিমধ্যেই সেদিন কান্তদা'র মুখে শুনেছিলেন, আমি ছেলে ভ্যাগাবণ্ড, কিন্তু আঁকতে জানি, গাইতে জানি, বাজাতে জানি, এমন কি কবিতা-গল্পও লিখি। তাই হঠাৎ তাঁর আর্ট-মশগুল soul আমার patroness হবার জন্য উৎসুক হয়েছে। কিন্তু আমি তা বেশ বুঝেছি এবং তাই বন্ধুত্বের দাবিটাকে মোলায়েম ভাবে ঠেলে দিতে দেরি করিনি। তাঁর 'সাধ' পূর্ণ না হলেই আমার সেদিনকার ও চিরদিনকার মর্যাদা তাঁর চক্ষে থাকবে অম্লান। তাই রয়েও গেছে......আমি তাঁর patronage কিছুতেই নিইনি—কলকাতায়ও সে বাড়িতে দ্বিঃর সঙ্গেই আড্ডা জমাতাম। কারণ, দ্বিঃর তো আর্টের pretension নেই, তাই বাঁচা গেছল। তাকে তো ভালো-মন্দ লাগার প্রশ্ন ওঠে না—সে

বালাই নিয়ে তারও দুর্ভাবনা নেই। লেখাপড়া সে যথেষ্ট শিখেছে—কিন্তু তাতেও তার দর্প নেই। তার কাছে যেতাম—কারণ বাঙালী মেয়ের মধ্যে অমন 'ভবঘুরে' আমি আর দেখিনি। (তবে সে বাঙালী কিনা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন; বাপ তো বাঙালীই, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালী হলেও 'মেয়ে' কি না, আপনার এই হল দ্বিতীয় আপত্তি। আমি কি করে এরজবাব দিই? তবে he who knows বলবে, হ্যাঁ, তা-ও—এখন আপনারা যাই ভাবুন)। বাঙালী মেয়ের মধ্যে-ও বস্তু আর আছে কি? চমৎকার খোলামেলা। সরস-শোভা-শালীনতা-হাব-ভাব-ছলা-কলা, কোনো বালাই নেই। তুমি লুঙ্গি পরে গেঞ্জি পরে বাড়িতে থাক, সেও তোমার সঙ্গে দেখা করবে পায়ে চটি, পরনে লুঙ্গি আর গায়ে গেঞ্জি। তুমি সিগারেট খাও, সে-ও সিগারেট ধরবে, আর তুমি যদি না-ও খাও, সে ধরাবেই ধরাবে। ঘরে আলাপ করছ, প্রথমেই সে আলো নিবিয়ে দেবে-—দু'জনে বসে আলাপের সময়ে আলোটা তার চক্ষুশূল হয়। একটুমাত্র তার ত্রুটি—কোথাও বেরুতে হলে তার একটি ঘণ্টা আয়োজন করতে হয়। তা যারা তাকে জানে তারা বিশ্বাস করবে না, ভাববে—'দূর! এক ঘণ্টা আয়োজনের ফলে কি মানুষ এমন দাঁড়াতে পারে।' সত্যি কথা, ফল দিয়ে বিচার করলে কথাটা অবিশ্বাস্য; কিন্তু তার ফটো—মা ফলেষু কদাচন। নইলে সে চমকৎকার। ভাগ্যবন্ধু তার জুটবেই জুটবে, ক'দিন পরে পরে তারা নূতন হয়, ক'দিনের বেশী এক দোকানেও সে জিনিস কেনে না, এবং true vagabondlike দোকান-বাকীও যথেষ্ট থাকে। কিন্তু দোকান-বাকী থাকে মিস চামেলিরও, তবে সে হচ্ছে নেকামির পুঁটলি, rather নেকামির hold-all. কিন্তু দ্বিঃর কাছে সে সব নেই—সব খোলামেলা—লজ্জা, মিথ্যা তোয়াজ, 'মনে ছিল না' এসব পাবেন না। একি কম কথা—একটি বাঙালী ভ্যাগাবণ্ড মেয়ে···।

বন্ধু থামলেন। অন্য বন্ধু বললেনঃ ভেগাবণ্ড মেয়ের চিত্র

পাবেন Jennyতে (Sigfried Undst). চমৎকার জিনিস অথচ বেশ delicacy আছে। পুরুষকে অমন বন্ধু বলে অকুণ্ঠিত মেনে বেপরোয়া ঘুরে ফিরে চলা দেখলেও ভালো লাগে—বেশ healthy, তবে সে হল উপন্যাস। কিন্তু বাস্তব জীবনে নাকি ও জিনিস মিলছে Red Virtueতে অর্থাৎ সোভিয়েট তন্ত্রে।

উঠল Without Cherry Blossoms-এর কথা—Romanoff-এর বইটা যে phase চিত্রিত করেছে সে phase নেই। আমিও এ কথা পড়েছি। মোটের উপর sexual moralityতে এখন রুশ যুবক-যুবতী অন্যদেশীয় সমবয়সীদের থেকে বেশী পরিচ্ছন্ন। তাদের সে সময় নেই, পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প হল এখন একমাত্র passion. —সমস্ত মানুষের কানে এমনভাবে তার মন্ত্র দেওয়া হচ্ছে, বেচারারা 'conditioned' হচ্ছে কাজের জন্য। Red Virtue এই-phase-এরই ছবি। হাউসিং প্রব্লেমের অসুবিধায় কর্তৃপক্ষ বিবাহেচ্ছু যুবক-যুবতীদের বাড়ি দিতে পাচ্ছে না। রইল কয়েক মাস এক-জোড়া মেয়ে আর ছেলে একঘরে—দুজনাই অন্যত্র engaged. আরো এক দম্পতি-ও আছে। ওরা কাজে বেরিয়ে যায়—দিনান্তে দেখা হয়, গল্প হয়, আড্ডা হয়, সবই কাজের প্ল্যান, socialist reconstruction-এর কল্পনা—good perfect chime, কিন্তু lovers নয়।

বিদূষকের সঙ্গসুখ

'মানময়ী গার্লস স্কুল' অভিনীত হল। এর আগে আমরা অভিনয় করেছিলাম 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক বাবুর' অভিনয়ও হয়েছে—সে বইটি বোধহয় একখানি ফরাসী কৌতুক-নাট্যের অনুবাদ। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র উপর চোখ পড়া স্বাভাবিক। কারণ, বন্দিশালা বন্দিনী-বর্জিত, তাই স্ত্রীভূমিকা যে নাটকে যত কম সে নাটকই তত এখানে অভিনয়-সাধ্য। পুরুষের স্ত্রীভূমিকা অভিনয় একটু দুঃসাধ্য কর্ম। কিন্তু অভিনয় তো 'অভিনয় নয়'-নয়; আসলে তো সত্যের আভাস, illusion; চিত্র, যেমন ফটোগ্রাফ নয় রূপায়ণ। চোখ-কানের মাথা না খেয়েও তাই বলা যেতে পারে শকুন্তলার ভূমিকা কোনো স-কুন্তলা বঙ্গবালাকেই করতে হবে এমন কথা নেই। সে 'ছলনা' কোনো রঙ্গ-কুশল বঙ্গ-সন্তানও করতে পারে—শকুন্তলার ধারণাটা উদ্রেক করলেই হল। গাছের গুঁড়িটা রঙ্গমঞ্চে না দেখলেও পাঠকের মন কল্পনা করতে পারে বৃক্ষান্তরাঙ্গে দুষ্মন্তই কথা বলছেন। আর এ দুষ্মন্ত যে হাবু দত্ত তা রসিক দর্শকের জানলেও বলত নেই, না জানলেও চলে। তা হলে, শকুন্তলা কি 'সুভাষিণী' না 'সুভাষ', তা জানারই বা এমন দরকার কি? শেক্‌স্‌পিয়রের আমলে দরকার হত না; এখনো বাঙ্‌লা দেশের শৌখীন অভিনয়ে তা হয় না;—চীনেও শুনেছি পুরুষেরাই নেয় স্ত্রী-ভূমিকা। তবে স্বীকার করতেই হবে—'সুভাষের' পক্ষে শকুন্তলা সাজা যত কঠিন 'সুভাষিণীর' পক্ষে তা তত কঠিন নয়। অবশ্য এও হল আপেক্ষিক—থিওরি অব রিলেটিভিটি বলচে সুভাষিণীর পক্ষে এই তুলনামূলক বিচার প্রযোজ্য নয়। আসলে কঠিন হচ্ছে বাঙ্‌লা দেশে সুভাষ-সুভাষিণীদের কোনো

ক্ষেত্রেই মিলিত উৎসব-পালন। অভিনয় তো দূরের কথা। সমস্ত প্রকাশ্য আয়োজনই এ দেশে এখনো স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত। সনাতন দেশটা প্রায় ইংরেজের এই বন্দিশালারই সগোত্র। কিন্তু, কতদিন থাকচে সেই বন্দিনিবাস? কংগ্রেসের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরে বঙ্গ-বালারা এসে দাঁড়িয়েছেন জেলের পথে। বিদ্রোহের অস্থির প্রচেষ্টায় প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার ব্রতে বাঙালী মেয়ে সাহসিনী। রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণা হাওয়ায় ভেসে ভেসে এক সময়ে বক্তৃতা মঞ্চও ছাড়িয়ে রঙ্গমঞ্চেও এগিয়ে আসবেন বঙ্গবালারা—এবং জেনানা-ফাটকের পরেই নৃত্যে নাটকে আসবেন। তবে তখন 'পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' অর্থাৎ দুঃখটা সেই 'গুরুদেবের' দুঃখ যেমন বলেছিলাম আমার বিপ্লবী দাদাকে। শিষ্য বাড়িতে এসেছেন গুরুদেব। মাংস রান্না হয়েছে, কিন্তু গুরুদেবের কাছে বামুন যেতে না যেতেই শিষ্যরা চেঁচিয়ে ওঠে—"না, না, না, বৃথা মাংস—গুরুদেবের চলবে না। গুরুদেবের চলবে না।" বার বার মাংস আসে; গুরুদেব লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, তাঁর পাতে আর তা পড়ে না। শেষে হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, "চলবে, সব চলবে, একদিন মা ভগবতীও চলবেন। তবে সেদিন আর এ বুড়োর দাঁত থাকবে না।" দাদার দশাও তাই—চল্লিশের উপরে, পঁয়তাল্লিশের দিকে চলেছেন—অকৃতদার দাদা দেশের স্বাধীনতার মতই স্ত্রী স্বাধীনতায় দাদা উৎসাহী। কিন্তু 'স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত' নাট্যের যুগ এখনো এ সমাজে শেষ হল না। একদিন তবু পালা শেষ হবে। 'পর্দা' যাবে টুটে ফেড়ে-ছিঁড়ে, মেয়ে পুরুষে সমানে পা ফেলে চলবে—জীবনমঞ্চে—আর রঙ্গমঞ্চে। বিধবা বিবাহ কেন, সধবা বিবাহও চল্‌বে,—কিন্তু তখন আর দাদার আর দাঁত থাক্‌বে না—(আমারও যে বেশী থাক্‌বে তা অবশ্য নয়।) তখন নিশ্চয়ই মঞ্চাভিনয়েও বিদুষীরা এগিয়ে আস্‌বেন—জীবনাভিনয়ে যাঁরা সততই

পারঙ্গমা। আর আমরা—দাদার বয়স্যরা? আমরা বিদূষকের মত বলব—দেহি! লড্ডুকঃ দীয়তাম্। কে জানে, সেদিন যৌবনের জয়টিকা পরা রাজপুত্র বল্‌বে—Fall on thy knees! তোমাদের কাল গিয়েছে। পক্ককেশে ফলস্টাফ-এর বাগাড়ম্বর আর চলে না!

আসুক সেদিন যবে আসবার। আপাতত, আমরা দাদার বয়স্যরা বসে তার কাল না গুনে এখানে একটু হাস্কাহাসির পাল তুলেই বন্দিশালার দিনগুলোকে একটু ভাসিয়ে দিই সেই ফাল্গুনের দিকে। অর্থাৎ এখানে আমরা করি অভিনয়—বন্দিশালাটাকে করে নেই রঙ্গশালা আর সমস্ত উদ্দেশ্যটাই অভিনয বলে আমরা চাই কৌতুক-নাট্য। গুরুগম্ভীর নাটক ছেড়ে এজন্যই সম্ভবতঃ আমরা অভিনয় করি প্রহসন বা কমেডি—যেমন, 'অলীকবাবু' বা 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। বাইরের বন্ধুরা শুন্‌লে বোধ হয় অবাক হবেন। কারণ, স্বদেশীরা তো প্রায় "রামগরুড়ের ছানা—হাস্‌তে তাদের মানা।" ভাবখানা অনেকটা এরূপ—"আমরা যে 'স্বদেশী', আমরা তো হাসতে পারি না"—আমাদের কোনো কোনো নেতাকে দেখলে নাকি একথাই সাধারণ লোকের মনে পড়ে। কথাটা কিন্তু সত্য নয়। মিশন যাদের মাথায় চেপেছে তাদের পক্ষে মন খুলে হাসা বড় কঠিন কাজ। সাধারণ মানুষের সমাজে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসতে পারা, হাসতে পারা, এ একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। আমরা সাধারণ মানুষ বলেই ভুলে যাই হাসি জিনিসটা কত অসাধারণ। হব্‌স্‌ই সম্ভবতঃ বলেছেন—অপর জীবের সঙ্গে মানুষের তফাৎ এই—মানুষ হাসতে পারে, অন্যজীব হাসতে জানে না। মানুষের পরিচয় যে কী, তা হব্‌স্‌ ভালো করেই জানতেন, তিনি অন্তত তা নিয়ে কোন স্বপ্ন পোষণ করতেন না। তবু মানুষ হাসে, এ বড় সহজ কথা নয়।

কিন্তু সব মানুষই কি হাসতে জানে? প্রকাশ্যে যিনি

হাসেন না, তিনিও হাসতে পারেন মনে মনে। এমন লোক তো আমিও দেখেছি—গম্ভীর-প্রকৃতি দেখতে-শুনতে, কিন্তু অসাধারণ তাঁর রঙ্গবোধ—আসলে তাই হয়ত তাঁর 'প্রকৃতি' যদিও তা তাঁর বাহ্য-লক্ষণ নয়। সব ক্ষেত্রেই অবশ্য তা বলা যায় না। যেমন 'পরশুরাম'। শান্ত, অচঞ্চল, গম্ভীর মানুষ; দেখলে সসম্ভ্রমে নিজেই সংযত হতে হয়। যখন '১৪নং পার্শী বাগানের' আড্ডা সরগরম, তখনো তিনি প্রায় নির্বাক। তিনি যেন দ্রষ্টা। এমন কি, দেখেন যে একটু তির্যক দৃষ্টিতে, তাঁকে দেখে তাও বুঝবার উপায় নেই। গম্ভীর পুরুষ, মনে হয় শান্তম্ শিবম্ তাঁর সঙ্গী। আমার তো মনে হয়—ওরূপই তাঁর প্রকৃতি—গম্ভীরও, রঙ্গ-সচেতনও। অর্থাৎ দ্রষ্টা। আবার বিপরীত লক্ষণের কৌতুক-রসিক লোকও দেখেছি। এক কলমও লেখেন নি তিনি। —অবশ্য লেখাপড়া তাঁরা শিখেছিলেন, সেদিনের বাঙ্‌লা দেশের লিবারল এডুকেশনের তাঁরা স্বচ্ছ শুভ্র দৃষ্টান্ত। গল্পে, আড্ডায়, উইটে, হিউমারে, প্রাণময় হাসিতে, আলাপে, অক্ষুদ্র সকলকে তিনি তাঁর সাহচর্যে করতেন স্বচ্ছন্দ। সে কৌতুক পিতা, পুত্র, অনুজ, অগ্রজ, নারীপুরুষ, সকলের একই সঙ্গে সম উপভোগ্য। তাঁর মনে এমন হিউমার যোগাত না যা সকলকে নিয়ে বলা যায় না, তেমন শাসনে তাঁর প্রয়োজনও হত না। কত অ্যানেক্‌ডোট্ কত এপিসোড, ইংরেজী সাহিত্যের ও দেশ-বিদেশের ইতিহাসের সংস্কৃতির কত উক্তি ও কাহিনী স্বতঃস্ফূর্ত যোগাত তাঁর মুখে। তাঁর স্বকীয় স্বচ্ছ রসিকতার মতই তা ছিল স্বতঃ উৎসারিত ও স্বচ্ছবাহী—তাঁর বৈঠকখানা ছিল হাসিতে আনন্দে জমাট, এডুকেশনের নির্মল স্বচ্ছন্দ কেন্দ্র। অথচ, তিনি যে মানুষ হিসাবে ছিলেন গভীর ভাবনার মানুষ তাও মিথ্যা নয়। আমার মত বাউণ্ডুলে পুত্ররত্নদের নিয়ে দুর্ভাবনাও ছিল প্রচুর। অথচ মরণের পরেও ওষ্ঠে লেগে রইল স্মিতহাস্য। আলাপে হাসিতে এক কথায় কালচারে।

আর একজন হিউমারিস্ট আমাদের বন্ধু (স্বর্গীয় অচিন্ত্যতোষ সেনগুপ্ত)। তিনি ঘরে ঢোকেন যেন একরাশি হাসির ঝলক সঙ্গে নিয়ে। তাঁরও বঙ্কিম দৃষ্টি মানুষের ছোট-বড় অসঙ্গতির দিকে সহজে আকৃষ্ট হয়। মানুষের চরিত্রের এদিকটির সঙ্গে যেন তাঁর জন্মগত পরিচয়, সাহিত্যেও তাঁর সহজ অনুরাগ। অথচ এককলমও তাঁর রঙ্গরচনা লেখা হল না। একটা বড় কারণ হয়ত তাঁর অনুকরণ শক্তি। বিশেষ মানুষের ভাষা, বিশেষ মানুষের স্বর, বাগ্‌ভঙ্গি, তাঁর শ্রবণ মাত্র অধিগত—সে শক্তিই তাঁকে বঞ্চিত করেছে বোধ হয় অপেক্ষাকৃত কঠিন সাধনা থেকে। আড্ডায় আসরে তিনি রীতিমত গুণী। লিখতে বসলে কিন্তু তাঁর সে প্রকৃতি আর স্বচ্ছন্দ থাকে না—যে ব্যক্তিত্ব মুখে চোখে স্বতঃস্ফূর্ত, লেখার মধ্যে তা অবগুণ্ঠিত। উল্টো দিকে দেখি অনেক লেখক আছেন যাঁরা আসরে মুখ খুলতেই পারেন না। একই সঙ্গে লেখায় ও বকায় স্বচ্ছন্দ মানুষ কম দেখা যায়—না দেখা যায়, তা নয়। সেগুণ আছে দেখেছি সজনীর। লেখা ও গল্প, দুটোতেই ওর কৌতুক-বোধ অবারিত। আসর জমিয়ে বসতে সে জানে—ওর প্রাণপ্রাবল্যের জোরে। অবশ্য আসলে তা ওর ব্যক্তিত্বের প্রমাণ—যে করেই হোক্ ওর ব্যক্তিত্ব বড়-ছোট সকল মানুষকে আকর্ষণ করে। প্রবাসী আপিসের আড্ডাটা সম্পাদকীয় আপিস ছেড়ে তার মুদ্রাকরের টেবিলে গিয়ে ঠেক্‌ল। 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা জমে উঠেছিল মোহিতবাবুর সাহিত্যিক ফ্যানাটিসিজম-এ যতটা, ততটাই সজনীর রঙ্গ-রসিক প্রাণবত্তার জন্য; তবে রঙ্গ অপেক্ষা ব্যঙ্গতেই সে মাত্‌ছে বেশী। তাতে তার শক্তির সদ্‌ব্যয় হচ্ছে কিনা সন্দেহ। এখন পর্যন্ত তার পরিচয় সে হচ্ছে সাহিত্যের আসরে half-a-bully এবং half-a-বিদূষক। কোনটাই মিথ্যা নয়। কিন্তু সে যে আরও কিছু, তা আরও সত্য। বাক্-চাতুর্য ও ছন্দ-চাতুর্য তার অসামান্য, কিন্তু গুণ হয়ে দোষ হল বিত্তার বিত্তায়, তার উপর যদি সুন্দরের সঙ্গেও

তার মিলন না ঘটে। প্রলোভন তো কম নয়—পাঞ্জাতে জোর আছে; আছে হাতের টিপ্। তারপরে, অমৃতলাল বসুর মত সে পেয়েছে বাঙালী রুচির ও বাঙালী রঙ্গবোধের একটা জন্মগত অধিকার। সেই ধারাতেই স্বতঃ উৎসারিত রঙ্গ-রসিকতায় সে জমিয়ে তোলে তার কথা ও লেখা। এ জন্যই তা জমে ভালো যখনি সজনী পায় শব্দ বা বাক্য বেঁকিয়ে বলে ব্যঙ্গ করবার সুযোগ, কিম্বা একটু অশ্লীলতা-ঘেঁষা রসিকতা করবার সুবিধা।

বাঙালী রসিকতার অবশ্য এইটিই Native রূপ। কথার প্যাঁচ আর আদিরসের মসলা—এ দু' জিনিস নিয়েই পণ্ডিত মশায়দের শ্লোক-রচনা আর কবি-তরজার লড়াই বরাবর চলেছে। অবশ্য সংস্কৃত নাটকের 'মহারাজ লড্ডুক খাব' ধরনের রসিকতার থেকে তা অনেক বেশী সজীব ও স্বচ্ছন্দ। এটা বড় আশ্চর্য যে, সংস্কৃতে কৌতুক রস কত তুচ্ছ, আর কৌতুক নাট্যও কত কম। আমার ধারণা ছিল খাঁটি 'ট্রাজিডি'র মতই খাঁটি রঙ্গপ্রধান 'কমেডি'ও সংস্কৃতে বুঝি আদপেই নেই। কিন্তু সুনীতি বাবুর কাছ থেকে শুনলাম তা আছে—'চতুর্বাণী' (?) না কি তার নাম। খান পাঁচেক রঙ্গনাট্যের নাম ও গল্পও তিনি বলেছিলেন—এর মধ্যে 'ভাগবতোজ্জকেয়ং'এর কথা মনে পড়ছে, গল্পটাও বেশ, রঙ্গনাট্যের সিচুয়েশন আছে। কিন্তু আর কয়টির কথা ভুলে গিয়েছি। মনে পড়ে ভাস-সৌমিল্যের লেখা 'পাদতাড়িকং' আর কার 'পদ্ম প্রভৃতকং'। মনে রাখবার মত কিছু নয়। মনে রাখবার মত কথা বরং এইটিই—কৌতুক রসের গুরুত্বটা আমাদের দেবভাষা-চর্চী পূর্বপুরুষগণ তত বুঝতেন না। আদিরসের ভিয়ানে ও কথার ফোড়ন দিয়ে আমাদের বাঙালী পিতামহরাই বরং তা একটু মুখরোচক করে তুলেছিলেন। তাও সুনীতিবাবু বলবেন—আমাদের অস্ট্রিক মূল রক্তের গুণ! যার গুণই হোক্, ওগুণ আমাদের আছে—'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।' আর এই আমাদের

রসিকতার বিশেষ রূপ—কথার প্যাঁচ আর একটু অশ্লীলতা-ঘেঁষা ইঙ্গিত। কিন্তু এই নিজের রূপের উপর একালের রুচি একটু রূপটান চড়িয়েছে। বঙ্কিমের পর থেকে মার্জিত কৌতুক-বোধ আমাদের সাহিত্যিক tradition ; এখনো তা ঠিক জাতীয় tradition নয়। বাঙালী রঙ্গরসের জাতীয় tradition বরং দীনবন্ধু অমৃতলাল প্রভৃতিকে আশ্রয় করে একেবারে 'ভোটরঙ্গ' পর্যন্ত চলে এসেছে। 'শ.চি'.ও তার সঙ্গে একটা যোগ রাখতে পেরেছে (কতকটা সজনীরই সহায়তায়) যদিও 'শ.চি.'র মুখটা যখন সাহিত্যের দিকে তখন সাহিত্যের এই মার্জিত রুচিবোধকেই একালে তারও মেনে চলতে হয়।

না মেনে উপায় নেই, তবু মাঝে-মাঝে আমাদের 'বাঙালীত্বের' প্রবক্তারা কতকটা জোর করেই বলেন—এ রুচিটি বি-জাতীয়। ইংরেজের পিউরিটানিজমকে ব্রাহ্মরা কবুল করে নিয়ে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর স্বভাব-সরস মনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। একথাটাই বা কি পরিমাণ সত্য? এইটুকু মাত্র যে ব্রাহ্মরা উপলক্ষ। আসলে ইংরেজী পিউরিটানিজম যার একটা আংশিক লক্ষণ এ হচ্ছে তারই স্বীকৃতি। সেই মূল জিনিসটি হচ্ছে 'আধুনিক কাল'—modern age, রেনেসাঁ থেকে যা ফরাসী বিপ্লবের ও শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে—এ কালের একটা পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'বুর্জোয়া সভ্যতা'। আধুনিক সভ্যতা কোনো একটা বিশেষ দেশের সৃষ্টি নয়—বিশেষ কালের সৃষ্টি। সভ্যতা দেশজ বিশেষ নয়, কালজ। অথবা অবস্থারই পরিণতি, ইতিহাসের প্রকাশ। সেই অবস্থাটা অবশ্য আধুনিক যুগে পরিস্ফুট হয়েছিল প্রথমে ইংলণ্ডে, তারপর ইওরোপে-আমেরিকায়। এজন্য তাকে বলি পাশ্চাত্ত্য, কিন্তু 'এহ বাহ্যঃ'। এখন এ সভ্যতা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই অবস্থার বিবর্তনেই বিশেষ একটা রুচিরও সৃষ্টি হয়েছে—সে রুচিতে ইংলণ্ডই কি আর পুরোনো সব জিনিস পছন্দ করে? করে না বলেই ভিক্টোরীয় রুচিরই তাড়নায় শেকসপিয়রকে পর্যন্ত

বাউডলার ছাঁটাই করতে বসেছিলেন। বাউডলারের দোষ নেই। তাঁর বোঝা উচিত ছিল রুচি জিনিসটা কালের সঙ্গে বদলায়; রসের আবেদন কিন্তু কালান্তরেও টিকে থাকে। যত সে রস খাঁটি হবে ততই তার সঙ্গে সকল কালের সঙ্গতি ঘটবে সহজে—রুচির পরিবর্তনেও তা হার মানবে না। রুচির ভ্রূকুটি সত্ত্বেও তাই রসের অমোঘত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না। প্রমাণ শেক্‌স্‌পিয়র স্বয়ং, সংস্কৃত কাব্য, গ্রীক নাটক। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই, সব রস তো অত ত্রিকাল স্থায়ী নয়। পুরোনো কালের রুচিতে অনেক দেশেই যা রসিকতা বলে উত্তীর্ণ হত, একালের রুচিতে অনেক সময়েই তা দোষাবহ বলে ঠেকে। অ্যারিস্টোফেনিস অনুবাদে পড়েছি; Clouds ও Frog-এর রসিকতায় কতই না হেসেছি প্রাণ খুলে। কিন্তু একালের রুচিতে মনে হয়নি কি, তা স্থানে স্থানে মাত্রাছাড়া? গ্রীক লেখা মাত্রাছাড়া! আর ইংরেজ রেস্টোরেশন কমেডি? —ওয়াই চার্লি? এক সময়ে তাও গিলেছি যথেষ্ট। অমন চতুর, নিপুণ রঙ্গব্যঙ্গ রসিকতা থাকলে হবে কি? মনে হয়েছে তা সত্যই সাহিত্যে 'পতিত'। কালের দিক থেকে অবশ্য তাও আধুনিক; কিন্তু সে আধুনিক হচ্ছে ভেতরে ভেতরে পচ-ধরা আধুনিক। তার মধ্যে বেহায়াপনা আছে, সাহস নেই; নির্লজ্জতা আছে, নির্ভয়তা নেই। আধুনিকতার বা বুর্জোয়া-বীর্যের মূলধর্মই নেই।

অবশ্য সে মূলধর্ম কি. তাও আবার তর্কের বিষয়। আমরা বুঝি মূলধর্মটা হোল ব্যক্তিগত মুনাফা একদিকে, আর দিকে ব্যক্তির উদ্‌যোগ, ব্যক্তির অধিকার; 'Rights of Man' ছিল তার নাম। Man নামক সত্তার দাবি, তার মর্যাদা—এটাও এই মূলধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। রেস্টোরেশনের সাহিত্যে মর্যাদা অস্বীকৃত। কি জানি কেন, এই বুর্জোয়া ভাবধারায় মানুষের দেহের সম্বন্ধে একটা দ্বিধাও যেন বেড়েছে—এইটাই পিউরিটানিজম-এর infection: আসলে মনে হয়—এই আধুনিক কালে সাহিত্যের নিজস্ব এলাকা সে চিহ্নিত

করে নিয়েছে। ব্যক্তির মতই সৃষ্টির জগতে সাহিত্য একটা বিশিষ্ট কলা-সত্তা হয়ে উঠেছে। তাই কামকলা দিয়ে তাকে ছলনা করলে সাহিত্য তা বরদাস্ত করতে চায় না। হয়ত এজন্যই আধুনিক সাহিত্য-রুচিতে বে-আব্রুপনা গ্রাহ্য হয় না। তার রুচিতে মাত্রাও ঠিক হয়েছে নতুন করে। তা বলে কি সাহিত্য খুব সুনীতিশাস্ত্রসম্মত হয়ে উঠেছে? বরং তার উল্টো। সাহিত্যে আজ সুনীতির বাড়াবাড়িও অগ্রাহ্য। একালের রুচিতে সুনীতিও বাধে। বরং দুর্নীতির থেকে বেশীই বাধে। অবশ্য রুচির দাবি ঠিকমত মেটাতে জানলে যেমন দেহ তেমন ধর্ম দুইই সাহিত্যে উপাদেয়; sex ও religion—এ দুইই সমাজের আদিপণ্য। একালের সিনেমার দিকে চোখ মেললেই তা বুঝি—এ সভ্যতার শেষ পুঁজি যেন sex appeal. কোনকালেই যে মানুষের উপর এই পঞ্চশরের প্রতাপ কম ছিল, এমন কথা বেদ উপনিষদ থেকে তো মনেই হয় না। বরং মনে হয় ঋষিরা এবিষয়ে বেশ full manই ছিলেন। না সেই মুনি যার শুকদেবের মত অমন অদ্ভুত ঝোঁক, কামিনী কাঞ্চনে বীতরাগ! বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি মুনিদের কথা না বলাই শ্রেয়ঃ। তপোবনের কোন্ প্রান্তে কোন্ অপ্সরা আবির্ভূতা হল; আর অমনি তপোমগ্ন মুনিচিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল; ফলে যা ঘটে তা আর না হয় না বললাম। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের মন যদি অত সহজে চঞ্চল হত তা হলে তো কলকাতা শহরে কেন, লোকালয়েই আমরা বাস করতে পারতাম না। বোধ হয় এই মুনিঋষিরা স্ত্রী-বর্জিত এই আটকখানায় নিরাপদে ধ্যান করতে পারতেন—অথচ আমরা করি নাটক, গান, খেলা, ইয়ার্কি—আর ধ্যান? তাও করি। লেখাপড়া, চিন্তা, ভাবনা, অশেষ তর্ক, অজস্র স্বপ্ন, অফুরন্ত কল্পনা—এ সবকে আশ্রয় করে সেই ধ্যানের ধোঁয়া—মাটির তলায় আগুন ধরা কয়লা খনির ধোঁয়ার মত—এখানে ওখানে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে—কে জানে ভেতরে কে জ্বলছে, কি জ্বলছে, কেন জ্বলছে? আসলে এই

অভিনয়ও তো তাই—অভিনয়, ধোঁয়ার ছল করে কাঁদা নয়, ধোঁয়াকে হাসির হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া। সে কান্নার সঙ্গে এ হাসিরও সম্বন্ধটা দূর নয়। শ্রেষ্ঠ হিউমার নাকি এ জাতীয় জিনিস—Learএর foolএর মত হাসির ছলে কাঁদা। রূপটাই তার ফলস্টাফের মত, আসলে এ ফলস্টাফ হচ্ছে ন্যুব্জ কাচে দেখা Prince of Denmark.

কথায় কথায় কিন্তু হিউমারের তত্ত্বকথা এসে গেল—থাক্ তা। বাঙালী রসিকতার স্বরূপ নিয়েই কথা হচ্ছিল। বঙ্কিমের পর থেকে আমাদের বাঙালী রুচি আধুনিক কালের রুচির দাবি মেনে নিয়েছে। অবশ্য সে মার্জনার উপরে রবীন্দ্রনাথ যে পরিমার্জনা যুগিয়েছেন তাতে তা একটু বেশী রকমে শোভন সংস্করণ হয়ে উঠেছে। তাঁর এই বুদ্ধি-শুভ্র wit ভাষায় ভাবে সেই কৌতুক রঙ্গে দিয়েছে পালিশ। শ্রী যতটা বেড়েছে কৌতুক রসের, ততটা শক্তি বাড়েনি। কিন্তু এ শ্রী ও শক্তি যে শুধু বাঙালী হাস্যরসের উপর তলাতেই ভেসে বেড়াচ্ছে, এমন কথা বলাও বোধ হয়—'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা'র সাধারণ রঙ্গালয়ে এমন সাদর সম্বর্ধনার পরে—ঠিক হবে না। বাঙালীর রুচি যুগের মত করে পরিবর্তন করেছিলেন বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যাদর্শের দাবিতে, রবীন্দ্রনাথ তাকে পরিমার্জিত করলেন একটু বেশী রকমের নিজের সাহিত্যাদর্শ দিয়ে—'মাজা কথা ও মাপা হাসি'র মাজনে বাঙলা কৌতুক রস বেশ একটা তন্বী চলচঞ্চলিনী হয়ে উঠেছে।

তবু তাতে মন প্রাণ ভরে না। অবশ্য এ কৌতুক শ্রী না পেলেও আমাদের চলত না—ভাষার আটপৌরে দীনতা তাতে থেকে যেত। রবীন্দ্রনাথের হাতে তা ধোপ-দোরস্ত গিলে-করা জামার মত একটা মসৃণতা পেয়েছে। কৌতুকের প্রধান উপকরণ অবশ্য ভাষার এই কলাকুশলতা নয়। কৌতুকের আসল উপাদান হচ্ছে 'কমিক সিচুয়েশন'—জীবনের অসঙ্গতি ভরা লগ্ন। অবস্থাটাই এমন যে হাস্যকর। তারপর আসে চরিত্রের কৌতুকদৃষ্টিতে রূপায়ণ। সিচুয়েশন

অবশ্য নাটকের প্রাণ। ঠিকমত সিচুয়েশন ফোটাতে পারলে আর ভাবনা থাকে না। ধরা যাক মানময়ী গার্লস স্কুল—রবীন্দ্র মৈত্র রবীন্দ্রনাথ নন বলেই এ নাটক নেওয়া ভালো। এমন একটি অবস্থাই (situation) নাটকখানায় রবীন্দ্র মৈত্র উদ্ভাবনা করেছেন যাতে পদে পদে অসঙ্গতি ঘটবে—কৌতুকই অনিবার্য কিন্তু কান্নার রেখাটাও কি চোখে পড়ে না?—কী অসহনীয় দুর্দশাতেই না একজন শিক্ষিত ভদ্র যুবক ও একজন ভদ্র শিক্ষিতা তরুণী মেনে নিয়েছে এই অসঙ্গত ও অসঙ্গতিপূর্ণ সিচুয়েশন! হাসি এ জন্যই হয়েছে গভীরতর। তারপরে আবার নায়ক-নায়িকা এসে পড়ল গ্রাম্য জমিদার দামু ঘোষ ও তার স্ত্রী মানময়ীর পরিবেশে। ঘোষের চরিত্র চিত্রণের সার্থকতায় এখানে হাসি হয়ে উঠল দশগুণ অমোঘ—আর সেই সেকেলে হৃদয়বান ব্যক্তিত্ববান মানুষটির চারিত্রিক দৃঢ়তা করেছে তাকে simple হলেও রীতিমত noble—সঙ্গে সঙ্গে নাটকের চরিত্রও গিয়েছে উন্নত হয়ে—প্রহসন না হয়ে তা হয়ে উঠেছে কমেডি। এর পরে অবশ্য কথা আছে—সহজ সরল ভাষার কথা, যেমন সাধারণ মানুষে বলে, এবং এ সব পাত্র-পাত্রীরা না বলে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এদিকে একটা বড় রকমের ত্রুটি ঘটে। তাঁর প্রত্যেক চরিত্রই এমন বাক্যনিপুণ মনে হয় যেন তারা সবাই কবির কথা কপচাচ্ছে—এক একটি শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী। এতে একটা কৃত্রিমতার ছাপ পড়ে যায়—তা পড়ে গিয়ে কথা ছাপিয়ে চরিত্রে। বলা বাহুল্য যেখানে তাঁর ত্রুটি ঘটে সেখানেই এ রকমের কথা খাটে। কিন্তু ত্রুটি ঘটে তাঁর কতটুকু? তবে যেখানে ঘটে সেখানে প্রায়ই ঘটে এরূপ উপলক্ষে—চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করার অপেক্ষা বাক্-নৈপুণ্যে চরিত্র সজ্জায় তিনি মন দিয়ে বসেন বলে। এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের wit অসাধারণ—তার চমৎকারত্বে বুদ্ধির পরিতৃপ্তি ঘটে। আমাদের কৌতুক রসের সাহিত্যে wit আর satireই বেশী। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পুরোনো কাল

থেকে ছিল—একালের পুরোনো নবীনের দ্বন্দ্বে ও অসামঞ্জস্যে তাই মূর্ত হতে দেরি হয় নি। সনাতনের মাপকাঠি দিয়ে দেখা সহজ। তাতে সহজেই সাড়া পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের satire প্রায়ই নতুনের বিরুদ্ধে। 'নক্‌শা' বোধ হয় হুতোমোর আগেই গত শতাব্দীর গোড়া থেকেই লেখা শুরু হয়ে থাকবে। witএরও আমাদের ধাৎ ছিল—পণ্ডিতী রসিকতা ও ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য কম জিনিস নয়। একালের রুচি তাকে শোধন করেছে, আর রবীন্দ্রনাথের মত মহামনীষী প্রতিভা তাতে শান দিয়েছে।

'তবু ভরিল না চিত্ত মোর'। বরং তার থেকে মজা পেয়েছি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়—কেমন যেন একটা রহস্য আছে তাতে, Alice in Wonderland-এর ধরনের একটা কল্পনা। অবশ্য তারপরে প্রভাতকুমারও যুগিয়েছেন রসিকতা।·. কিন্তু চিত্ত যদি ভরে থাকে তবে ভরেছে দুএক সময় বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের' দৌলতে। তাতে হিউমারের আভাস আছে, কিন্তু হিউমারের ঔজ্জ্বল্য নেই। সেই রসের পূর্ণাস্বাদন কমলাকান্তেও পাই না, আমার মত 'কমলাকান্ত-fan'কেও মানতে হবে।

কমলাকান্ত কিন্তু কমলাকান্ত—De Quincey'র Opium Eater বললেও তার কথা শেষ হয় না। হয়ত সে বঙ্কিম স্বয়ং। যাক্, কিন্তু 'হিউমারের' আশ্চর্য-লোকে আমাদের লেখকেরা প্রবেশপত্র বিশেষ পেলেন না কেন? জীবনে যে আমরা হিউমার-শূন্য জাত তা তো মনে হয় না। আমার মত বাঙালও যে একেবারে Caledonian নয় একথা হয়ত এলিস স্বীকার করতেন। অন্ততঃ তাঁর গুণমুগ্ধ এই ভক্তের মুখ চেয়েও একটু চোখ টিপে মৃদু হেসে বলতেন—'নো, for you know you feel you miss it, what Caledonians don't. না, তুমি বুঝতে পারছ কৌতুক রস তোমাদের নেই—ক্যালিডোনিয়ান হলে তা বুঝতেও পারতেন না।' আমিও এলিসকে বলতাম,—কিন্তু থাক্ আমার ও এলিসের সে কথোপকথন আর এক

সময়ে না হয় তা লেখা যাবে—সেই imaginary conversation. একথা তো তাঁকে বলতে পারতাম—এলিসের মত সরস রচনা আমরা না লিখি—'কমলাকান্ত' বা 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' আমরা লিখেছি।

কিন্তু ইংরেজী Essayর (রবীন্দ্রনাথ যাকে নাম দিয়েছেন 'প্রবন্ধ') কথা আর এক সময়ে হবে। রবার্ট লিণ্ডএর সরস আলাপন আমার এখনকার সাপ্তাহিক পথ্য। আসলে এই পথ্যের কথাটাই ছিল আমার আজ বুঝবার কথা। হিউমার শুধু পথ্য নয়। আমার মতে পাথেয়ও শুধু নয়—হিউমারের পথই জীবনের দৃষ্টিপথ। ভালোমন্দ সব নিয়ে, সকল অসঙ্গতি অসামঞ্জস্য নিয়ে এই জগৎ একটা স্পোর্ট—আমাদের শাস্ত্রকাররা বলবেন লীলা। এ লীলায় ভাসৃতে ভাসৃতে সবাই চলি। কেউ অবশ্য সাঁতার কাটি, কেউ হাত-পা ছুঁড়ি। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে নাকানি-চুবানি খাই। কিন্তু এরই মধ্যে এই লীলা যদি কেউ একটু দেখতে পারে দ্রষ্টার মত দাঁড়িয়ে তা হলে নিশ্চয়ই তার মনে হবে একি কৌতুক নিত্যনতুন ওগো কৌতুকময়ী। তারপর—এই বিস্ময় কাটিয়ে—'এত বড় রঙ্গ জাদু এত বড় রঙ্গ।' এই রঙ্গবোধ অবশ্য জীবনের নবরস মিশিয়ে তৈরি করা এক প্রসন্ন সরসতা যা মনে করতেই আমার মনে পড়ে শেক্সপিয়রকে—জীবনকে এই শেক্সপিয়রীয় সরস দৃষ্টিতে দেখা—এটাই হিউমারের পরম তত্ত্ব। এ রকমের কৌতুক-বোধ শুধু পথ্য নয়, শুধু পাথেয় নয়, আমি বলি তাই 'পথ'—not the means but the end to see life. See it whole শুধু নয়, feel it a good joke. নরনারীর পরস্পরের আকর্ষণ যদি হয় আদিরস, তবে এই sense of humour, এই সর্বানুভূতিমূলক কৌতুক রসকেই বলব—পরম রস।

কিন্তু এই মহারসের তত্ত্বও থাক্। ও পথ জেলখানায় খুঁজে পাওয়া ভার—দেহমনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা না থাকলে হিউমারকে আপনার করে নেওয়া যায় না। তা হলেও তার পাথেয় নিয়ে

এই বনবাসের দিনগুলোকেও interesting করে তোলা যায়। তা তোলা অন্ততঃ প্রয়োজন। হাস্তরসের রসায়ন হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ভালো tonic, জোরদার সালসা। আর হিউমার অপেক্ষাও এই রুগ্ন জঠরে লঘুপাচ্য হাসিরই প্রয়োজন বেশী। স্বাস্থ্যের এই দাবি বুঝে না-বুঝে আমরাও মেনে নিই। তাই খুঁজি লঘু নাটিকা, রঙ্গনাটক, প্রহসন ইত্যাদি। 'মানময়ী গার্ল'স স্কুল' তাই আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু তাতে আমার অভিনয় ঠিক উৎরোয়নি। সন্দেহ হচ্ছে,—কোথাও একটা ঘাটতি পড়ছে।

খুঁজে বের করলাম তাই হাসির গল্পের বই। কোন্ বই? না, কুলীন কেউ নন। মার্কটোয়েন ও জেরোম কে জেরোম নন, এমন কি, সুইফ্ট নন, হিলেরে বেলোক নন,—অযন্ধকার কেউ নন। গল্প লেখক। পি. জি. ওডহাউস্। এখানে তাঁকে আমদানি করেছিলাম আমি। 'আউটলাইনের' যুগে যখন নানা বিদ্যা গোগ্রাসে গিলছি তখন একদিন বিলাতী কাগজে দেখলাম বিজ্ঞাপন—'জীব্স্ অমনিবাস্' প্রকাশিত হচ্ছে। সতীবাবুকে বলতেই তিনি কেনবার জন্য পত্র দিলেন—এদিকে তাঁর সঙ্গে আমার রুচি-সাম্য বহুব্যাপক। বই এল, আর 'জীব্সের' রসাস্বাদনে আমরা দু'জনা হয়ে গেলাম নতুন করে সহযাত্রী। তারপর অবশ্য 'জীব্স্ অমনিবাস্' অনেক হাত ঘুরেছে, কিন্তু একেবারে হাতছাড়া হতে দিই নি। পরহস্তগত বই ও পরহস্তগতা বউ undamaged ফিরে আসে না। কিন্তু আমাদের মত এমন বার্টি উস্টার জীব্স্ও বোধহয় এ আটকখানায় আর পায় নি, তাই এই বই আমাদের কাছে অধর্ষিতই ফিরে এসেছে।

ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রের পক্ষে পি. জি. ওড্হাউসের নিকট বশ্যতা স্বীকার, বোধহয় একটা সকরুণ ব্যাপার—mild tragedy. হয়ত উদ্দাম হাস্যেরও প্রহসন হয়ে উঠতে পারে—ওড্হাউসের

হাতে। আমি ইংরেজী সাহিত্যের অর্থোডক্স্‌ ছাত্র—চসার থেকে শুরু করে নানা যুগের বহুমান্য লেখকদের লেখা অল্পাধিক উদরস্থ করেছি। 'আধুনিক' নিয়ে উচ্ছ্বসিত নই, যদিও অল্‌ডাস হাক্‌স্‌লির 'রোটাণ্ডা' ও ডি. এইচ. লরেন্সের কবিতা উপন্যাসের সংগ্রহও আমাদের কম নয়। আর প্রথম কৈশোরে শেক্সপিয়রকে চিনবার পরেই পেয়েছিলাম—বার্ণার্ডশ', গল্‌সোআর্দি, এইচ. জি. ওয়েলস প্রমুখদেরও সাক্ষাৎ। কিন্তু হার্ডির পরে জয়েস্‌-এ, আর ইয়েট্‌স্‌-এর পরে ইদানীন্তন এলিয়টে আসতে আমার পা সরলেও মন সরে না। হাজার হোক, লোকলজ্জা বলে একটা কথা আছে—ইংরেজী সাহিত্য পড়েছি-পড়িয়েছিও কিছু কিছু; কুলীন ছেড়ে ভঙ্গ নিয়েও কাজ করেছি। কিন্তু তাই বলে একেবারে জাত দিই কি করে? যৌবনের প্রথমে স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন-এর পৃষ্ঠায় যখন সমসাময়িক ইংরেজী বহুবিক্রীত মাসিক সাহিত্যের রূপ চিনতে শুরু করেছি তখন একদিন সচিত্র একটি গল্প পড়লাম পি. জি. ওড্‌হাউসের (জীব্‌স্‌কে নিয়ে লেখা)। কাহিনীতে, ভঙ্গিতে, ভাষায়—একেবারে যেন মাৎ হয়ে গেলাম। অথচ ক্লাসের অধ্যাপক বা রসিক বন্ধু-গোষ্ঠীতে তাঁর নাম শুনিনি। ভয়ে ভয়ে দু'একখানে নাম করতে গিয়ে থেমে গিয়েছি—গমিষ্যামি উপহাস্যতাম্‌। জানি তো, এ দেশে আমরা যেমন ম্যারি-করেলি-হল-কেনকে উঁচু সাহিত্যিক মনে করি শুনে সাহেবরা হাসে; তেমনি ওদের দিনকে দিন খোরাক যোগায় হাসির, শিকারের, ভ্রমণের, খুনরাহাজানির, এমন অনেক বহুশ্রুত নাম আছে এড্‌গার ওয়ালেস্‌, বেরোনেস্‌ ওর্‌জি ইত্যাদি যারা সাহিত্যের দরবারে কল্‌কে পায় না—ক্রাইম ডিটেকশন-থ্রিলারের সেই আজগুবী গল্পের যোগানদারদের মত ওডহাউস্‌ও হয়ত আজগুবী হাসির ব্যবসাদার। সাহিত্যে তাঁর দাবি আদপেই আছে কিনা সন্দেহ। সন্দেহটা আরও পাকা হয়েছিল একটি সত্য কাহিনীতে। বিনয় (মুখোপাধ্যায়) বলেছিলেন, "রেলে আলাপ হল এক ফিরিঙ্গী

মেম সাহেবের সঙ্গে। যাচ্ছেন আসানসোল। আমার হাতে ওডহাউস্ দেখেই তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন, "পড়েছ? পছন্দ হয় তোমার ওঁর লেখা?" সম্মতিসূচক উত্তর পেতেই বল্‌লেন, "He is wonderful." তারপর আমি বাঙালী বলেই আমাকে বুঝিয়ে বল্‌লেন, "He is the greatest English writer ever born, you should know."

বিনয়ের রসবোধ অসামান্য। অন্য সময় হলে সেই রেলওয়ে কর্মচারীর মহিষমর্দিনী অর্ধাঙ্গিনীর দিকে তাকাতেনও না—যুবতী হলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

"তাই নাকি?" তারপরে ধীরে ধীরে ভালোমানুষের মত বিনয় বল্‌লেন, "আমাদের যে বলে, শেক্‌স্‌পিয়র নামে কে একজন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইংরেজী লেখক?"

"শেক্‌স্‌পিয়র?—What is he?"

"অনেক নাটক লিখেছেন—আমাদের পড়তে হয়।"

"বাজে নাটক পড়ো কেন? তার চেয়ে go to the pictures. চার্লির অভিনয় দেখেছ? He is the greatest actor."

আরও বিপদ হল। চার্লির সম্বন্ধেও আমার দ্বিধা এরূপ। চার্লির কাণ্ডে না হেসে উপায় নেই; কিন্তু এ হাসি কি কাল্‌চারের উচ্চ মানদণ্ডে সহনীয়? ইংরেজের স্টেজে ইংরেজী 'কমেডি'র অভিনয় না দেখলে সাহস করে কি করে বলি—এ হাস্যরস আমার ভালো লাগে, চার্লি আমার প্রিয়। বিশেষতঃ চার্লি যখন আজও সকলের প্রিয়—বিড়িওয়ালা, গাড়িওয়ালাদের হিরো—তখন আমার মত কালাচারড ম্যান কি করে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে লণ্ডনের পথে চীৎকার দিই—'স্বাগত চার্লি'—যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে এলেন ও গেলেন তার জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই সেই জনগণদেবতার? মনে মনে চার্লি আর ওডহাউস্‌কে তারিফ করলেও ঠিক বুঝতাম না কি করে মুখেও তাদের তারিফ করতে

পারি। এমন সময় এলাম জেলে—jail the great leveller. এক মুহূর্তে বুঝে নিলাম—হাসি = বাঁচি। এই প্রকাণ্ড equationটা আয়ত্ত করে আর দ্বিধা রইল না যে, চার্লিকে তো পাব না এখানে, তা হলে যদি পাই ওড্‌হাউস্‌কে তাতেও পারব হাস্‌তে। আর হাসা মানেই বাঁচা।

অতএব, স্বাগত ওড্‌হাউস্‌। Carry on Jeeves—Inimitable Jeeves—অবশ্য Psmithকে পাব না। Meet Mr. Mullerও সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু জীব্‌স্‌ একাই একশ'—আমার কাছে, এখানে।

জীব্‌সের এ পৃথিবীটা কোথাকার জানি না—বিলাত দেখিনি কিন্তু তবু এই জগৎ সেখানে মিলবে না, মনে হয়। শুনেছি—ওড্‌হাউস্‌ নাকি আমেরিকাতেই বাসা বেঁধেছেন; জীব্‌স্‌-এর কল্যাণে তার আভাসও পাই। কিন্তু জীব্‌সের জগৎ ও মার্কিন জগৎ এক নয়, তা বুঝতে দেরি হয় না। বার্টি উস্টার, ব্লাণ্ডিং ক্যাস্‌ল্‌ ও ড্রোন্‌স ক্লাব্‌ আমাদের কানে শোনায় বিলাতী বড় ঘরের নিষ্কর্মাদের কথা।—ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, বুদ্ধিও নেই, দুর্বুদ্ধিও নেই, আছে শুধু শৌখীন পায়রার জীবন—অবশ্য একটা কথা—ওড্‌হাউসের মতে এই আরাম-পালিত-ঋষভদের জীবনে ক্লেদও নেই। তবে ক্লেদও যেমন নেই, কীর্তিও তেমনি নেই। কীর্তি দূরের কথা, কাজই নেই—এ সমাজের মানুষের। Idle class বল্‌লেও হয় না; দায়দায়িত্ব নেই বল্‌লেও অনেক বলাই বাকী থাকে—বলা উচিত এদের মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই। এই মানুষগুলো ফাঁপা মানুষ নয়, ফাঁপা ফানুস্‌। জীবনকে দেখবার, বুঝবার প্রশ্নই নেই। কারণ, ওড্‌হাউস্‌ আর যাই হোক, জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ। আসলে এ হচ্ছে বয়স্য বিদূষকের পৃথিবী—পৃথিবীতে যেমন বিদূষকের আর কোনো কাজ নেই রাজাকে হাসানো ছাড়া, ওড্‌হাউসেরও তেমনি আর কোন কাজ নেই—পাঠককে হাসানো

ছাড়া। অবশ্য, বিদূষক হচ্ছেন রাজার সর্বাপেক্ষা বড় অনুগত সহচর—তাই একমাত্র তারই অধিকার আছে রাজাকে ভেংচি কাটবার। Fool ও Lear-এর সম্পর্কের কাঠামোটাও তাই, গোপালভাঁড়-কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্কটাও এর একটা গ্রাম্য বাঙালী সংস্করণ। ওড্‌হাউসেরও বিশেষ অধিকার হল বিলাতী অ্যারিস্টোক্রাসিকে নিয়ে এমনি রঙ্গ-তামাশা করবার। তবে তফাৎ অনেক—প্রথমতঃ কোথায় বা সেই 'মহারাজ লড্ডুক খাব'—আর সেই ধরা-বাঁধা প্লটের মধ্যে ধরা-বাঁধা বয়স্যের ভূমিকা। সেখানে কতটুকু সত্যকারের অসঙ্গতি সৃষ্টির অবকাশ থাক্‌ত? আর কোথায় বা এই বিংশ শতকের—কবেকার? এডওআর্ডিয়ান? না, জার্জিয়ান যুগের আরাম-বিলাসী ড্রোন্‌স্‌-দের চরিত্রকার ওড্‌হাউস্‌—অফুরন্ত বৈচিত্র্য-সৃষ্টির অবকাশ যার মিলেছে এই বিচিত্র ইংরেজ-মার্কিন জগতের শোষণ-লালিত ঐশ্বর্যের অভাবনীয় ঘটনা-সন্নিবেশের অশেষ বৈচিত্র্যময় পরিবেশে? এমন বহুস্ফীত সভ্যতা, এমন চলমান শতাব্দী, এমন শোষণ-লালিত 'ড্রোনের' পরিবেশ না পেলে এত ঘটনা-বহুল কাহিনীর পরিকল্পনাই করা যেত না। মানুষের কল্পনা সেদিনও সামান্য ছিল না—দেবদৈত্য গন্ধর্বকিন্নর, রূপকথা উপকথার রাজপুত্র রাজকন্যা, রাক্ষস রাক্ষসী, পক্ষিরাজ, শুক সারী—এসব অজস্র জুটেছে লোক-কল্পনায়। আরব্য উপন্যাস আর একটা তেমনি জগৎ। কিন্তু এ কালের কল্পনা আরও নূতন উপাদান পেয়েছে—একদিকে এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌দের মত টাইম-মেশিনে চেপে আমাদের নিয়ে যায় অসম্ভবের রাজ্যে, সে পাড়ায়ও আমার গতায়াত আছে বেশী নয়, তবু জুল ভার্ণে ও এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর জগৎটা ঘুরতে ভালোই লাগে। কিন্তু আজগুবী জগৎ তো নয়, আমরা যে চাই বিদূষদের জগৎ, সং-এর সমাজ। আর ওড্‌হাউস্‌-এর জগৎটা হচ্ছে সেই উপরতলার সংদের fantastic world; তাঁর 'সং' হচ্ছে সব ড্রোন্‌স্‌। অবশ্য দেখে-শুনে মনে হয়—সং হোক্ যাই হোক্, তাদের

প্রতি তাঁর কোনো উষ্মা নেই। তিনি তাদের রসজ্ঞ সতীর্থ বোধহয়। তিনি এ শ্রেণীরই সামাজিক সমজদার।

মোটামুটি তিনি এই সমাজ-কাঠামোর ভক্ত—কারণ, এই কাঠামোর প্রসাদেই দায়-দায়িত্বহীন মন নিয়ে বিদূষক-জীবনও খুশিমত যাপন করা যায়। রাজা-রাজড়া না থাকলে চলে বড়লোক বিদূষকের? না থাক্‌লে চলে বয়স্যের? কৃষ্ণচন্দ্র না থাক্‌লে চলে গোপাল ভাঁড়ের? 'ড্রোন্‌স্‌ ক্লাব' ও ইংলণ্ড-আমেরিকার এই leisure class না হলে চলে ওড্‌হাউসের? অন্যদের চল্‌লেও ওড্‌হাউসের কিছুতেই চলত না এই ধরনের leisure class democracy না হলে। কারণ, ইংলণ্ড-আমেরিকার এ বিদূষকের পোষণকর্তা এখন জমিদার-অভিজাত নয়, সে হচ্ছে রিণ্ড। পাবলিক অর্থাৎ ডিমোক্র্যাসির কল্যাণে সংখ্যাবর্ধিত শিক্ষিত-বর্গ। এ ডিমোক্র্যাসির কল্যাণে রাজা-রাজকন্যা ডিউক-লর্ডদের চাল-চলন-চরিত্র-রীতি-নীতি বিষয়ে তাঁর সাধারণ মানুষরা অভ্যস্ত অনুগত। আর সে সব গল্প কথায় কৌতূহলী এক-একটি জীব্‌স্‌ বেশ জানে কার কোথায় স্থান—জন্মসূত্রেই তা ঠিক হয়ে আছে—চিরদিনই থাকবে। না থাকাটাই অস্বাভাবিক। ক্রমভঙ্গ জীব্‌স্‌দের পক্ষে অসহ্য—টাই পরা থেকে বিয়ে করা পর্যন্ত। এরা ফলস্টাফ নয়—যে যুবরাজকে ভাববে স্যাঙাৎ, Hal বলে ভাববে। বার্টি উস্টারদের চালিয়ে নিয়ে গিয়েই জীব্‌স্‌রা সার্থক ও পরিতৃপ্ত। আর ওড্‌হাউস্‌-ধরনের বিদূষকরা? তারাও জানে এই নিয়ম—ওপর-তলায় এরূপ মানুষ থাকবে, নিচের তলায় অমনি কাজের মানুষরা থাকবে, আর বিদূষকরা থাকবে—এখন আর ওপরতলার প্রসাদজীবী-ভুক্ত নয়। নিচেরতলার দক্ষিণায় যে এখন ওপরতলার সঙ্গে বস্‌তে অধিকারী—অর্থাৎ সবারির পরিষদ্‌।

যাহোক হোক্‌গে ওড্‌হাউস্‌; কিন্তু আমি বলছিলাম—লোকটার প্লট আবিষ্কারের শক্তি—শুধু আবিষ্কারের নয়, তার

বিন্যাসেরও। সে সূত্রেই আমার মনে পড়ছিল তার পরিবেশের কথা। আমাদেরও তো পরশুরাম হাস্যরসাত্মক প্লট আবিষ্কার করতে কম চেষ্টা করেন না—কিন্তু সে আমাদের পরিবেশে, তাতে 'কচি সংসদ', 'বিরিঞ্চিবাবা' বেশ মানিয়ে যায়। 'ভুশুণ্ডীর মাঠ' তো প্রথম শ্রেণীর আর্ট হয়ে ওঠে। সে কাজ ওডহাউসের সাধ্যাতীত কিন্তু উদ্ভাবনার শক্তি তাঁর সত্যই প্রচণ্ড।

বার্টির হবি শিল্পী হবে—খুড়োর বা মামার মাসোহারা আদায় না করলে চলবে কেন? কিন্তু খুড়ো বুঝেছেন—বার্টি কিছু করবে না। তারপর, বার্টি এক ঝিএর সঙ্গে পড়েছে প্রেমে। খুড়োর মাসোহারা বন্ধ হবার কথা। জীব্‌স্‌ ফন্দি দিলে বুড়োকে বাগানো যায়—বুড়ো পক্ষী-পাগল। 'শিশুদের সাথী' নামে একটা বই লিখিয়ে নিতে হবে মিস সিঙ্গারের নামে। মিস সিঙ্গার বই উৎসর্গ করবেন খুড়োকে—শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও পক্ষী-প্রেমিকের করকমলে। তা হলেই মিটে যাবে। মিটে গেল—কিন্তু অন্য ভাবে। মিস সিঙ্গারই ও সূত্রে হয়ে বসলেন খুড়ী। কালক্রমে এই নবদম্পতির পুত্ররত্ন এল, বার্টি পেয়েছে তার চিত্র আঁকবার ভার।—ট্রাজিডিকে আঁকতে পারত নিশ্চয়ই। কিন্তু খুড়ীকে নিয়ে ছবি দেখতে দেখতে খুড়োর চক্ষুস্থির—কোথায় সেই খুকুমণি? একটা কিম্ভুতকিমাকার মর্কটের মত ছাপ! মাসোহারা এবার নিঃসন্দেহে বন্ধ হবে। উপায়?—জীব্‌স্‌ বুদ্ধি বাৎলালে—সংবাদপত্রে হাসির ছবি হিসাবে পাঠিয়ে দিলে একে মারে কে? এ থেকে বার্টি-চিত্রের একটা সীরিজ শুরু করা যেতে পারে—সপ্তাহে সপ্তাহে দৈনিকের রঙ্গ-রসের পৃষ্ঠায় বেরুবে। সত্যিই দেখা গেল, তাই হ'ল। এভাবেই বর্টির শিল্পী-জীবনের শুরু হল। আর এই গল্পের সূত্রেই প্রথম নাকি জীব্‌স্‌ চরিত্রের সূচনা হয় ওডহাউসের মনে। এ গল্পে অবশ্য পুত্রের অংশ বেশী জটিল নয়। কিন্তু অনেক গল্পেই তা বেশ

ঘোরালো। ওল্‌ড্‌ বিকিই হোক্‌, কি ইয়ং রিঙ্গোই হোক্‌, কিম্বা বার্টি উস্টারের নিজের বন্ধুই হোক্‌, প্রত্যেক গল্পেই একের পর এক পাকিয়ে ওঠে ঘটনার জট। তারপর অবশ্য মুস্কিল আসান রূপে এসে দাঁড়ায় জীব্‌স্‌—জট খুলে যায়। বন্ধু সিপির বড় বিপদ। সে লেখক মানুষ—ভরণ-পোষণ করে বুড়ী খুড়ী। তিনি যাচ্ছেন কোথায়, ব্যবস্থা করেছেন তিন সপ্তাহের মত সিপি গিয়ে থাকবেন কেম্ব্রিজে—তাঁর খুড়ীর অধ্যাপক বন্ধুর পরিবারে। না বলবার উপায় নেই সিপির—এমন চমৎকার সংসর্গে তার শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ উন্নতি হবে। কিন্তু সিপির মাথায় বজ্রাঘাত। বার্টির মত বন্ধু তাকে বাঁচাবে না। বাঁচানোর মালিক জীব্‌স্‌। বার্টি তো গোলই পাকাতে পারে। পুলিসের সঙ্গে গোলমাল করতে উস্কিয়ে দিল সিপিকে, পাঠিয়ে দিল তাকে জেলে। অধ্যাপকদের বাড়ি তা হলে আর যেতে হবে না। কিন্তু সিপি না গেলে সব কথাই তো বুড়ী খুড়ী জানবেন —তখন? জীব্‌স্‌ বুদ্ধি দিলে—'সিপি' নাম নিয়ে বার্টিই গিয়ে থাক্‌ কেম্ব্রিজের অধ্যাপকদের বাড়ি। বার্টি! অধ্যাপকদের বাড়ি! তবু বন্ধুর বিপদ ঘাড়ে নিতে হল—জীব্‌স্‌-এর ভরসায়। তারপর সেখানে বার্টির কাণ্ড—একদিকে অধ্যাপকের বিড়াল-পাগলা খুড়ী, অন্যদিকে অধ্যাপকের প্রায় প্রেম-আপসী কন্যা হেলোয়সি। সে আবার অনরিয়া গ্লোসোপ-এর মত দেখতে—হাঁড়িপানা মুখ, হেলোয়সি আসলে তার মাসতুত বোনই। তবে রোডারিক গ্লোসোপের মেয়ে অনরিয়ার হাত থেকে বার্টি কি তখন সহজে নিস্তার পেয়েছে? পেতই না, স্যর রোডারিক শেষ পর্যন্ত ওকে মাথা খারাপ ঠাউরে ছিল বলেই বার্টি রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু এই কেম্ব্রিজের বাড়িতে সিপি নামী বার্টির নিত্যনূতন বিপদ সেই বুড়ীর রাগ আর ছুঁড়ীর অনুরাগের মধ্যে। বিচিত্র সে সব কাণ্ড। হঠাৎ সে বাড়িতে একদিন ডিনারে এসে পড়লেন স্বয়ং

রোডারিক—আর ভেঙে গেল বার্টির সিপি-সাজা। এখন উপায়? জীব্‌স্ পরামর্শ দিলে—সিপির খুড়ীকে গিয়ে আগেই সব বলো—সিপি জেলে একথাও বলতেই হবে। আবার এ দায়ও নিতে হবে বার্টিকে? কি করে? জীব্‌সের কথামত তাই বার্টি গেল বল্‌তে ভয়ে ভয়ে। শুনেই বুড়ী কিন্তু মহাখুশী। 'পুলিসের পেটে এক কিল মেরে আমার ভাইপো গিয়েছে জেলে। কী মজা! কী মজা!' যাক—সিপির তো তা হলে বিপদটা কাটল। কিন্তু সিপির জেলের খবরে বুড়ী খুশী হল কেন? জীব্‌স্ জটটা খুলে দিলে—বুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া চলছে সে গ্রামের পুলিসের। পুলিসের নামেই বুড়ী আগুন। গ্রামের পুলিসের দলের সর্দার আবার জীব্‌স্-এর মাসতুতো ভাই। তাতেই এ ভাবে ঘটনাটা পেকে উঠেছে—অবশ্য জীব্‌স্ তার দাদাকেও কিছু দিয়েছিল—তার জন্মদিনে মাত্র পাঁচ পাউণ্ডের প্রেজেন্ট্‌স্। পাঁচ পাউণ্ড! আরও পাঁচ পাউণ্ড তখনি বার্টি উস্টার দিয়ে দিলে জীব্‌স্‌কে। সত্যই জীব্‌স্ একটি রত্ন।

এমনি ঘোরলো গল্প একটার পর একটা। সব যেন মাপমত মিলে যায়, সব খাপ খেয়ে যায়। জীব্‌স্ যেন মুস্কিল আসান! এই উদ্ভাবনী শক্তিটা চমৎকার। অবশ্য যে সব ঘটনা ওডহাউস্ উদ্ভাবনা করেন তা আজগুবী—তাঁর সমস্ত জগৎটাই আজগুবী—ঠিক মানুষের জগৎ তা নয়। এমনকি জগৎই নয়—সং এর সংসার—সং-সার।

মজা এই বিদূষক হলেও ওডহাউসের গল্প কিন্তু আদিরসের মসলা দিয়ে ভাজা নয়। প্রেম নিয়ে সস্তা হাসি আছে—কিন্তু বিদ্রূপ নেই। তাছাড়া, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি কোনো গুরু জিনিসকেই লক্ষ্য করা তার নিয়ম নয়।

অবশ্য শুধু প্লটের বৈচিত্র্য ও বাঁধুনিই একমাত্র কথা নয়। একমাত্র কেন, প্রধান কথাও আমার মতে তা নয়। প্রধান কথা

আসলে হচ্ছে ওডহাউসের বাগ্ভঙ্গি, ভাষার চাতুর্য, শব্দের অভিনবত্ব। সাহিত্যের ইংরেজী ভাষাই আমরা পড়ি; কথ্য ইংরেজীর স্বচ্ছন্দ রূপটাও কতকটা চিনি; তবু ইংরেজী ভাষার কতটুকুই বা আমরা জানি—আমরা যারা বিলেতের জাহাজ চোখে দেখিনি? চলতি গল্পের রূপ দেখে তবু সত্যই আমি মুগ্ধ হই। সত্যই কত বিচিত্রই না হয়েছে এখন ইংরেজী গদ্য। ইংরেজী গদ্যের এই বিচিত্র শ্রীর সঙ্গে আমার নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নীরদ চৌধুরী—এজন্য তাঁর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। ইংরেজী বলতে আমি একেবারে অনভ্যস্ত। ইংরেজী-বলিয়ে—বিলাত-ফেরতা বা বিলাত-ভক্ত ভারতীয় বন্ধুদের মুখে কত আশ্চর্য বচন শুনে মনে মনে হিংসে হয়। এখনো মনে পড়ে এণ্ডো ব্যাণ্ডো বন্ধুদের সে সব বুকনি—I don't know him from the Adams. He is a big gun. আর patter. ওডহাউসের ভাষাও তাদের মুখে না শুনেছি তা নয়। যেমন old tops, beams ইত্যাদি। কিন্তু সে ভাষা নকল করা কার সাধ্য? একে তো তা ওডহাউসের আবিষ্কার। তারপরে তা অনেক ঘষা অনেক মাজা—মুখে অমনি আসবে কি করে? তার গল্প যে ধরলেই টেনে নিয়ে চলে তার প্রধান কারণ এই—বলবার ভঙ্গি। ভঙ্গি বলতে অবশ্য বোঝায়—বলার ভঙ্গি যা দেখার ভঙ্গিরই নামান্তর, আর ভাষার চাতুর্য। এই ভঙ্গি একেবারে নিজস্ব ও নতুন; যেখানেই হোক, দশ লাইন পড়লেই মনে হবে আর কারও হতে পারে না। এমনিতে মনে হয় বুঝি তা কয়েকটা কথার কৌশল, কিন্তু কেউ কি গুনে গুনে বসাতে পারে—মেজাজে তার আমেজ না থাকলে? একটা মেয়ে মাত্র ঘরে কিন্তু বার্টির বক্তব্য every nook and corner bulging with blighted girls. কিম্বা

"Have you see Mr. Fink-Nottle, Jeeves?"

"No, Sir."

"I am going to murder him."

"Very good, Sir."

এই 'very good, Sir' অপূর্ব। অনেকখানিই অবশ্য আছে নানা সুপরিচিত কৌশল—

"I am reading you my poem. The one I wrote to Cynthia last night. I'll go on, shall I ?

"No."

"No ?"

"No. I haven't had my tea."

এরূপই পুনরুক্তি করে, ফিরিয়ে বলে, তামাশা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া আসল মজা হচ্ছে ওডহাউসের ভাষার। যে-কোনো জায়গায় আরম্ভ করলেই দু'চার লাইনে তা চোখে পড়বে: তাই করছি আগাথার প্রথম বর্ণনা:

We run to height a bit in our family, and there's about five-foot-nine of Aunt Agatha, topped of with a leeky nose, an eagle eye, and a lot of grey hair, and the general effect is pretty formidable.

কিম্বা, আর একটি ছোট কাণ্ড: The girl took the piece of paper, shoved it in her bag, grabbed the money and slipped it to brother Sidney, and then, before I knew what was happening, she had darted at me, kissed me and legged it from the room.

এ হচ্ছে কথার সাধারণ ধরন। অবশ্য ওডহাউসের আসল চতুরতা হচ্ছে বাক্যালাপের রচনায়। আর তার প্রত্যেকটি ছোট ছোট কথাই চমকপ্রদ। পড়ে কেবলই মনে হয় ইংরেজী ভাষার যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে তা যেন ভাবাই যায় না। এমন ভাষার জোর না পেলে এধরনের ইয়ার্কির রচনা অনেকটাই খুঁড়িয়ে চলত। অবশ্য সিচুয়েশন

উদ্ভাবনাই হচ্ছে প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু ভাষার খেলাটাও প্রায় তার সমতুল্য। কত শব্দসম্পদ এ ভাষার, আর তা নিয়ে কিই না করা যায়। slang অবশ্য একটা বড় ঝুলি—egg, cove, প্রভৃতি তার থেকে কত কি যে বেরোয় সময় মত, তা দেখলে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। কিছু কিছু কথা বোধহয় ওডহাউস নিজে তৈরিও করেন। কিন্তু আসল মজা হচ্ছে শব্দের প্রয়োগে—সে শব্দ slang হোক, সাধু হোক, কিম্বা সৃষ্টি হোক। ইংরেজী ছাড়া অন্য কোনো ভাষার এ গুণ আছে কিনা জানি না। অন্তত বাঙলায় এখনো সম্ভব নয়। আমাদের ভাষাযও নতুন শব্দ তৈরী হচ্ছে—দেশী ভাষার তেজ তাতে তো ঠিক বেরিয়ে আসছে না। ইংরেজীর চক্করে পড়ে ইংরেজী-ঘেঁষা ধরনটা বাড়ছে, কি ইয়ার্কিতে কি আলোচনায়। না হলে রঙ্গ-তামাশায় আমরা সহায়তা নেই—হিন্দীর, উড়িয়ার, আর শেষ পর্যন্ত বাঙাল রীতির। নাটকে প্রহসনে তো দীনবন্ধুর আমল থেকেই আমাদের একটা ভরসা—বাঙাল; তারপর অভিনেতাদের তোতলামি, কিম্বা খুঁড়িয়ে চলা ইত্যাদি। কানা খোঁড়া নিয়ে ঠাট্টা জমে কেন, বের্গসঁ তা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ওটা বেশী দূর যায় না। মানুষের যান্ত্রিকতা বা অবস্থার অসঙ্গতি হাসির প্রধান উপকরণ। প্রাণকে আমরা সৃজনধর্মী ও নিত্যনব বলে জানি ও মানি; আর ওরূপেই পেতে চাই। কিন্তু প্রাণ যেখানে অপ্রত্যাশিত ও পরাহত সেখানে হাসি পায় না, পায় নিজেদের অসহায়তা বোধ। খোঁড়া খোনা দেখলে হাসির অপেক্ষা এ বোধই জাগে। যাক্ laughter-এর তত্ত্ব। তা বহু পরিমাণেই সত্য। কি পরিমাণ মিথ্যা সে বিচার না করেও আমরা বুঝি—বাঙাল কথা দিয়ে হাসানো বা তোতলামি দিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া বাঙালী থিয়েটারের দর্শকদের কাছেও এখন স্থূল ঠেকে। রুচি বদলাচ্ছে—আধুনিক কালের রুচি অন্তত আর একটু ভিন্ন রকমের ভাঁড়ামি চায়—ভাঁড়ামি একেবারে চায় না তা নয়, মুখে যাই বলুক। বিকৃত হিন্দী

উড়িয়া নিয়ে আমরা এখনো তাই করি। তবু ভাঁড়ামিও আর একটু নতুন হোক—তাই লোকে চায়—প্রমাণ চার্লি। ভাঁড়ামির (ক্লাউনের) একটা সিনেমা সংস্করণ সে প্রথম আবিষ্কার করে, তারপরে দর্শককে আরও দু-এক স্তর উপরে টেনে নিয়ে চলেছে। সিনেমাকে গোল্ড রাশ-এর মত ছবি যুগিয়ে আসল হিউ-মারের এলাকায় পৌঁছে দিয়েছে। সাহিত্যে অবশ্য ভাঁড়ামির জায়গা নেই; ক্লাউনের গ্রাম্যতা সেখানে রুচিবিরুদ্ধ। তবে বয়স্য বিদূষকের এখনো স্থান আছে—যেমন, সবকালেই ছিল। কালি-দাসের কালেও ছিল, শেক্সপিয়রের কালেও ছিল। হাসির যুগও বোধহয় ঐ যুগেই এসেছে। কারণ হাসি হচ্ছে, great leveller—বড় democratic force। ঠিকমত সিচুয়েশন আর কথা যোগালে রাজাও হাসবেন, রাজ্ঞীও হাসবেন—রাজা হাসলে পরিষদরা হাসবে, রাণী হাসলে সখীরা হাসবে। কিন্তু রাজা না হাসতেই দর্শকেরা হাসবে, রাণী না হাসতেই দর্শিনীরা হাসবে। বোধহয় কথাটা ঠিক হল না; হাসবে সবাই—রাজা, রাণী, পাত্র-মিত্র, প্রজা, পরিজন—যদি লোকের চোখের সামনেও না হয় তাহলে নিশ্চয়ই হাসবে একা একা; পড়তে পড়তে হেসে উঠবে যদি হাতে আসে গড্ডলিকা বা কজ্জলী আর একসঙ্গে বসে হাসবে—যদি দেখতে পায় তেমন অভিনয়। মানময়ী গার্লস স্কুলই বা মন্দ কি? বিশেষ করে—যখন দেখছি তাতে জেলের মানুষও হাসতে পারে। আর হাসা মানেই বাঁচা, অন্তত এখানে। সে হাসির জন্য ব্রিটিশ বিদূষকেরও কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করি। আরও বেশী ভাবি—এত অল্প হাসির যোগানদার আমাদের ভাষায়—পরশুরাম কেদারনাথ এমনি দু-একজন মাত্র যখন আছেন—তখন আরও দু'চারজন বাঙ্গালী বয়স্য বিদূষক পেলে আমরা অন্তত খুশী হতাম।

বিজ্ঞানের মাপকাঠি

আমাদের বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা প্রায়ই ক্ষেপে যান একথা শুনে 'Economic science, Political science, etc.' ওসব আবার সায়েন্স কি? এসব তথ্য নিয়ে না চলে experiment, না চলে demonstration; সত্যমিথ্যা যাচাই করবার যখন ল্যাবরেটরি-সম্মত (ও ল্যাবরেটরি-সম্মানিত) কোনো পন্থা নেই তখন এদের 'বিজ্ঞান' নাম দেওয়া অজ্ঞানের পক্ষেই সম্ভব। এ তর্ক পুরানো—যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তারা সাধারণতঃই অন্য বিদ্যাকে সে সম্মান দিতে নারাজ। একটি নূতন বন্ধুও সেদিন নূতন Economics পড়তে বসে তাই বৈজ্ঞানিক-সুলভ অবজ্ঞায় ঐ পুরানো কথা বলে বসলেন: এ আবার সায়েন্স কি? একটু সংযতভাবেই আমরা বললাম, এ বিদ্যাও সায়েন্স হতে পারে—অন্তত এই অর্থে যে সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও বিদ্যাকেই সায়েন্স বলা চলে। বন্ধু পরিহাস করে বললেন, ওঃ!

আমরা মার্জনা-প্রার্থীর মত নিবেদন করলাম, কিন্তু এ হ'ল সায়েন্স কথার মোটা অর্থ, যাকে জর্মনরা বলে Wissenschaft; কিন্তু science কি একমাত্র natural science (অর্থাৎ Natur wissenschaft) সম্বন্ধেই প্রযোজ্য? আমরা মিলিটারী science বলি, Sociology-কেও সায়েন্স বলি, আর সাইকোলজি তো সায়েন্সের এলাকাতেই এসে পড়ল। এসব কি বাজে কথা? এসবের জ্ঞান আজও পাকা হয়নি, এ বিজ্ঞান সবে যাত্রা শুরু করেছে; তাই এদের বৈজ্ঞানিক মূল্য এখনও স্থির হয়নি। তেমন তো Natural scienceএর পুরানো সূত্রও বদলে যাচ্ছে—সেখানেও তো স্থাণুত্বই অনড় হয়ে বসেনি। বিজ্ঞানের স্বভাবই হল সত্যানুসন্ধান; আর

এ সন্ধান চলে একটা বিশেষ প্রণালীতে যার নাম সায়েন্টিফিক মেথড। যে-কোনো শাস্ত্রের গবেষণা তার যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীতে চললেই আমরা সে শাস্ত্রকে বিজ্ঞান নাম দিতে পারি অর্থাৎ Science বলতে Natural scienceই মাত্র না বুঝে, আমরা বুঝি একটি প্রকরণ-সম্মত বিদ্যা—তা Biologyও হতে পারে আবার Economicsও হতে পারে। এমন কি, সোবিয়েত দেশে তো সাহিত্যও সায়েন্সের অন্তর্গত। সব বিজ্ঞান একাদেমির অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের বন্ধু কথাটা মানলেন আংশিকভাবে; তাঁর মতে scientific method-এর প্রধান একটি লক্ষণই হল তার পরীক্ষা-সাপেক্ষতা। ফিজিক্স-এর অনেক তথ্যই আমরা এই প্রকরণ সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারি—যদিও বীক্ষণাগারে চন্দ্রসূর্য দুইই জড়ো করে তার আকর্ষণে যে জোয়ার ওঠে, তা দেখানো চলে না।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা সায়েন্সের মূলসূত্র কি মনে করো? আমাদের উত্তর: পরীক্ষা-সাপেক্ষতা নয়, প্রমাণ-সাপেক্ষতা অর্থাৎ বিজ্ঞানের মূলসূত্র law of causation এবং এ সূত্রের উপরেই Economic Science ও Political Scienceও দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। আমাদের বন্ধু বললেন: বিজ্ঞানের কাজ নিয়মের রাজ্য আবিষ্কার, অনিয়মের মধ্যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা এবং অপেক্ষাকৃত ছোট নিয়ম (law) থেকে বড় নিয়মে ক্রমারোহণ—শেষ পর্যন্ত 'এক-মেবাদ্বিতীয়ম্' নিয়মের সন্ধান যতক্ষণ তা ধরা না পড়ে। Economics কি Politics কারোর কাজ এ নয়; তাই তারা বিজ্ঞান নয়। অবশ্য তোমাদের Law of causationও ওসব বিদ্যার উপর প্রয়োগ করা অসম্ভব—তাই, তোমাদের মতেও এসব বিদ্যার ধারা বৈজ্ঞানিক হতে পারে না।—বন্ধুবর থামলেন, কিন্তু মনে হল তিনি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের কথা বলছেন—তার প্রণালীর কথা বলেননি। বিজ্ঞানের প্রণালী বিশ্লেষণাত্মক, তার উদ্দেশ্য হল নিয়ম আবিষ্কার—এই আমাদের সাধারণ ধারণা।

সম্প্রতি আগস্ট মাসের ফর্টনাইটলি রিভিয়ু পত্রে জুলিয়ান হাক্সলিও দেখছি প্রশ্ন করেছেন, "Can Sociology Become A Science?" প্রশ্ন থেকেই বোধগম্য হয়, সমাজতত্ত্ব এখনো বিজ্ঞান হয়নি, 'বিজ্ঞানের' পদবীতে তা আদপেই উঠ্‌তে পারবে কি না, তাই হাক্সলি বিচার করছেন। বলা বাহুল্য, If I were a Dictator-এর লেখক সমাজতত্ত্বকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান দ্বারা তার শোধন ও বোধন করতে চান। হাক্সলির যুক্তির ধারা সংক্ষেপে এই: মানুষমাত্রেরই মনে পূর্ব থেকে ঝোঁক ও সংস্কার জমে থাকে, সমাজবিদ্যার আলোচনায় তা দেখা দেবে। কিন্তু Natural Science-এর আলোচনায়ও সে খাদ থেকেই যায়। অতএব, ঐ bias-এর গলদের কথা পেড়ে সমাজবিদ্যাকে বিজ্ঞানের দরবারে 'অচ্ছুৎ' করবার এ যুক্তি আপাতত মুলতুবী থাক্। অন্য সব যুক্তিই দেখা যাক্। (১) বিজ্ঞান মাত্রেরই যাত্রারম্ভের দিকে অনেক বাজে কথা, ফোঁটা-তিলক, ঝাড়-ফুঁক থেকে শুরু করতে হয়েছে। Pythagorian theory of numbers, element ও humour (বায়ু, পিত্ত, কফ?) Ptolemic astronomy, alchemy ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আজকে পয়লা নম্বরের টিকিধারী বিজ্ঞানগুলির জন্ম হয়েছে। সমাজবিদ্যার ওসব গলদ দেখে ঠোঁট বাঁকালে কি হবে? সে এখনো বিজ্ঞান-জন্মের সূতিকাগারে—অথবা হয়ত মাতৃগর্ভে জন্মের অপেক্ষায় আছে। (২) বৈজ্ঞানিকেরা সন্দেহ করেন সমাজ-বিদ্যা আদপেই বিজ্ঞানোচিত আধার কি না—The nature of material, they claim, precludes the application of true scientific method. এ বিষয়ে হাক্সলির বক্তব্য: সোশ্যাল সায়েন্সের নিয়মকানুন অর্থাৎ প্রকরণ (methodology) ন্যাচারাল সায়েন্সের পদ্ধতি থেকে একটু-আধটু স্বতন্ত্র হবে; সে প্রকরণ আবিষ্কার করাই এখনকার সোশিওলজিস্টের কাজ। সোশ্যাল সায়েন্স অপেক্ষা করছে তার

বেকনের জন্য, তার 'নবাম অরগ্যানাম'-এর জন্য। যেমন মানবমনের এক প্রসারণ-যুগে বেকন ও ন্যাচারাল সায়েন্সের মূলসূত্র (induction) জন্মেছে, তেমনি মানবসমাজের বর্তমান প্রসারণক্ষণে জন্মাবে সমাজ-বিজ্ঞানের আগমাচার্য ও তাঁর নূতনাবিষ্কৃত অভিনব প্রকরণ। জুলিয়ান হাক্সলি তদুদ্দেশ্যে অনেকগুলোও পথ বাৎলেছেন: চাই National Planning Board, Social Science Research Council, National Academy of Social Sciences etc.; বিশ্ববিদ্যালয়ে, সরকারী, বেসরকারী কারখানায় বৃত্তিধারী গবেষক; ইত্যাদি।

হাক্সলির দ্বিতীয় যুক্তি এই: সোশ্যাল সায়েন্স নিয়েও পরীক্ষা সম্ভব। তবে, তার control বিষয়ে নজর রাখতে হবে। সে পরীক্ষা অন্য তুলনায় জটিলতর, আর তার ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণতর। তবু, ভালো করে ক্ষেত্র তৈয়াবি করলে, শিক্ষা, জন্মশাসন, খাদ্য, public ownership, এসবের প্রয়োগ পরীক্ষায় scientific result পাওয়া যাবে (যেমন, Tennesse Valley Authority করছেন public vs. private ownership of generation and distribution of electric power নিয়ে)। ভুলচুকের সম্ভাবনা থাকবে;—সে সম্ভাবনা কি ন্যাচারাল সায়েন্সেই নেই? প্রত্যহই তো physicsএ পর্যন্ত ভুল ঘটে।

অতঃপর, হাক্সলি আরও কয়েকটি সূত্র সন্ধান করেছেন—যা সোশ্যাল সায়েন্সের 'প্রকরণ' বলে গ্রাহ্য হতে পারে: Law of causation অর্থাৎ কার্যকারণ সূত্র যেমন Natural Science-এর বেলা—একান্ত মানবীয় ব্যাপারে তা তেমনটি হতে পারে না। কারণ-সমূহ মানুষের ব্যাপারে জটিল, বিমিশ্র ও বিচিত্র,—ফলও তেমনি বিচিত্র ও বিমিশ্র। যুদ্ধের কারণ কি? জাতীয়তা, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা, শাসকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সামাজিক চিত্ত-বিকৃতি, এমন কত কি। আর যুদ্ধের ফল?—সে তো ১০ বৎসর পরে ১৯৩৫ সনের দুনিয়াও

গুনে শেষ করতে পারছে না। অতএব মনে রাখতে হবে এই যে, (১) মানবীয় ব্যাপারে 'বহুবিধ কারণ ও বহুবিধ ফলাফল' একটি মোটা সূত্র ('A, B, C, are partially cause of X, but also, in varying measure of Y, Z' etc.) (২) সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে 'সত্য', 'ন্যায়', 'truth', 'justice' প্রভৃতি abstract কথা বর্জনীয়—ন্যাচারাল সায়েন্সও এভাবে ছেড়েছে 'perfection' প্রভৃতি অবাস্তব কথা। (৩) Bias ছাড়া, প্রবণতা-বর্জন হচ্ছে প্রধান কাজ- 'নিস্পৃহতা' কি করে মানব-মনে সঞ্জাত করতে হবে তাই মনোবিজ্ঞানের একটা বড় সমস্যা হওয়া উচিত। কারণ, এ ক্ষেত্রে মতামত গঠিত হয়ে থাকে পূর্বেই—পরে সংগ্রহকরা বলে মতানুযায়ী তথ্য। প্রকৃতপক্ষে, সমাজ-বিজ্ঞানের অনেক কথাই মনোবিজ্ঞানের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়—যথা, কেমন করে মানুষের উৎসাহ জাগিয়ে রাখতে পারা যায়? প্রোপাগ্যাণ্ডা কখনো কখনো কেন ব্যর্থ হয়? মানুষের মন কতটুকু পুরুষের পর পুরুষে এগোচ্ছে? তার কতটুকু মনো-বিজ্ঞান কতটুকু বা অর্থবিজ্ঞানের চেষ্টায় নিয়মিত করা চলে? ইত্যাদি।

হাক্সলি বলছেন—তবু গোঁড়া বৈজ্ঞানিক বলবেন bias আর মতদ্বৈধ মিলে সব চেষ্টা ভেস্তে দিতে পারে। তা সম্ভব। প্রত্যেক সায়েন্সের একটা practical দিক আছে—সমাজ-বিজ্ঞান সেদিকে খরতর দৃষ্টি রাখলে মোটের উপর তার বনিয়াদ ভাঙবে না। এবং সমাজতথ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আহৃত হলেই সামাজিক কর্মপদ্ধতি বেশী efficient হবে—কার্যকরী হবে।

হতাশ হবার কারণ নেই। প্রাণিবিদ বলেন, কেমন করে জড়-ইন্দ্রিয় থেকে মননের দিকে জীবজগৎ এগিয়েছে ও সহজ প্রবৃত্তি-অনুগামিতা থেকে নিপুণ কর্মতৎপরতার দিকে জীবজগৎ এগিয়েছে। —স্নায়ুমণ্ডলী শেষে মানুষে এসে হয়েছে ব্রেন—যাতে অভিজ্ঞতা,

চেতনা ও কর্ম সংশ্রিত হয়েছে। সোশিওলজির কাজ হবে এই scientific integrationকে নূতনতর levelএ টেনে আনা—"If it does this, it will have done a great deal towards converting science from a series of isolated nerve-centres into what it should and might become—a real brain for society."

জুলিয়ানের রাজ্য

'If I were a Dictator—যদি আমি একনায়কত্ব পাই, যদি সার্বভৌম কর্তৃত্ব লাভ করি, তাহলে আমি কি করব', এই যুগের অগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলি তা ওই নামের একখানা বইতে ব্যাখ্যা করেছেন। পিপীলিকার জীবন-বৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ করে আফ্রিকার অদৃষ্টপূর্ব জীবজন্তুর জীবন পর্যন্ত জীবতত্ত্বের প্রাণতত্ত্বের সমস্ত জিনিসেই জুলিয়ানের যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টি, তেমনি সমন্বয়-সাধনের শক্তি। বর্তমান জগতের সামাজিক প্রশ্নেই কি তাঁর অধিকার কম? তাঁর বিজ্ঞান-সেবক মন সমাজ বিজ্ঞানকে সত্যসত্যই 'বিজ্ঞানের' কোঠায় টেনে নিতে চায়—অন্যান্য বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রকরণ দিয়ে সমাজের সমস্যাগুলিকে যাচাই-বাছাই করে, শোধন-বোধন করে। অতএব, তাঁর ডিকটেটারশিপ হবে বিজ্ঞানের ডিকটেটারশিপ। দেখা যাক, সে বস্তুটি কি?

প্রথমেই জুলিয়ান বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যক্তিগত লাভের ও লোভের সমাজ, এর জায়গায় তিনি আন্‌তে চান সে সমাজ যা'তে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও আবিষ্কারের দৌলতে দ্রব্যজাত এমন সস্তা হবে যে তা ইতর সাধারণের ভোগে ও উপভোগে লাগ্‌বে—কয়েক-জনের মুনাফার অঙ্ক ফাঁপিয়ে রাখবার জন্য যন্ত্রপাতির দর চড়িয়ে রাখা (এবং তাই অভাবগ্রস্তকেও বঞ্চিত রাখা) যে ব্যবস্থায় চলবে না। জুলিয়ান কম্যুনিস্ট নন; কিন্তু ১৯২৯ এর থেকে পুঁজিবাদের এই সঙ্কটগ্রস্ত সমাজে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা আর ভাবতে চান না যে incentive of private profitই মানব-সমাজের একমাত্র সম্ভাব্য বুনিয়াদ। তাই বহুপুরুষের বুর্জোয়া জুলিয়ান গোড়াতেই বলেছেন —এ বনিয়াদ নাকচ হবে। তাঁর পরিকল্পনার মুলকথা এই যে,

একমাত্র বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই মানুষের প্রকৃতি-বিজয় (মানব-প্রকৃতিও তার অন্তর্গত, যে মানব-প্রকৃতির আবার বিশেষ উদ্ভাবনা তার সমাজ) দ্রুত এবং কল্যাণকর উপায়ে সম্পন্ন হতে পারে। তাই তাঁর প্রথম প্রস্তাব—চাই সায়েন্স কাউন্সিল। বৈজ্ঞানিক পরিষদ বলে দেবে, বিজ্ঞানকে কোথায় কিভাবে কি কাজে লাগানো যাবে। কথাটা কি খুব 'ধোঁয়া' বলে মনে হচ্ছে? লেখক তাই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—ধন-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের যোগে দেখ্‌তে হবে, কি করে 'ব্যক্তিগত লোভের' অপেক্ষা সমাজে 'প্রভূততম লোকের স্বাচ্ছন্দ্য' বড়ো বলে স্বীকৃত হয় (যখন বিজ্ঞানের দৌলতে উৎপাদন প্রচুর হবে এবং সুলভ হতে থাকবে)। তাঁর দ্বিতীয় কথা—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যা ফল তা পুরোপুরি আদায় করা,—লোকের স্বাস্থ্যগড়া, বর্তমান সমাজের কলঙ্কগুলি অপসারিত না করলে মানুষ এসব বিষয়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান সত্ত্বেও ফললাভ করতে পারছে না। তাঁর তৃতীয় দৃষ্টান্ত হল, শিক্ষার গবেষণা। সুযোগের অভাবে শতকরা নিরনব্ব্‌ই জন মানুষের বৃত্তিসমূহ বিকশিত হতে পায় না, শিক্ষা গবেষক দেখবেন কি করে এই 'পতিত জমিতে' সোনা ফলানো সম্ভব।—এমনি করে, ভাবী সমাজের গোড়াপত্তন হবে, যাতে এই লোভাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থা থাকেবে না, মানুষের আয়ত্ত হবে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও চিত্তোৎকর্ষ!

অন্যদিকে পুরো স্টীমে চালাতে হবে বর্তমান সমাজের যন্ত্রটা। সে যন্ত্রগুলি যদি বিজ্ঞানের কারখানায় তৈরী হয়, তা হলে এই সমাজের অনেক অদল-বদল হয়ে যাবে। তার মরচে-পড়া অংশগুলি scrap হয়ে পড়ে থাকবে, আর নূতন নূতন অংশের বলে সমাজ হবে অনেক বেশী efficient. সেই উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ বর্তমানের কাজ চালাবার জন্য—জুলিয়ান প্রথমেই স্থাপন করবেন তিনটি গবেষক-পরিষদ (Research Council)—

(১) প্রতিরক্ষা (Defence), (২) অর্থ-বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান বিজ্ঞান (Economics and Statistics) এবং (৩) মনোবিজ্ঞান সমন্বিত সমাজবিজ্ঞান (Social Science including Psychology). এই তিন বিভাগের কাজ Co-ordinate করবে Central Science Council (কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান পরিষদ)। কিন্তু কোন্ বিজ্ঞান শাখার কাজ কি ? জুলিয়ান বলেন, অর্থবিজ্ঞান দেখবে বাস্তব আর্থিক সমস্যাগুলি যথা, কো-অপারেটিভ্ vs. private trading ; quota regulationএর ফলাফল, মার্কেটিং বোর্ডের কাজ ; বড় শহরের যানবাহনের সমস্যা, অবশ্য তা ছাড়াও থিওরেটিক্যাল গবেষণা এবিভাগ চালাবে ইকনমিক সূত্রগুলি নিয়ে। সমাজবিজ্ঞান পরিষদের কাজ হবে, শুমার ও population problem ; বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন স্থানের মানুষের জন্মমৃত্যু, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, কর্মনিপুণতার তথ্য সংগ্রহ এবং বিশেষ বিশেষ শহরে বা পাড়াগেঁয়ে পাড়ায় অম্নিতর তথ্যানুসন্ধান। আমি কিন্তু ভাবছি, যদি Statistics কেবলমাত্র শিল্প পণ্য ও কৃষিজাতের হিসাবে শেষ না হয়, তা হলে তো Statistics-ও সমাজবিজ্ঞানেরও তথ্য-চর্চার কাজগুলি করবে। আসলে সমাজ-বিজ্ঞান জিনিসটি এতো বড় যে লজিক্যাল ডিভিশানে অর্থ-বিজ্ঞান তার একটা শাখামাত্র। সম্ভবতঃ শাসন সৌকর্যের জন্যই দুটোকে দুই কাউন্সিলে ভাগ করা জুলিয়ান-এর অভিপ্রেত। তাছাড়া, সকলের কাজ মিলিয়ে নেবার জন্য তো Central Science Council আছেই।

জুলিয়ান শুধু সরকারী বিজ্ঞান পরিষদের উপর ভরসা রাখেন না, তিনি বেসরকারী কল-কারখানাদারদের বাধ্য করবেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তৎসম্পর্কিত গবেষণাগার রাখতে, বাইরের মেধাবী আবিষ্কর্তাদেরও তাতে কাজ করতে দিতে এবং কারখানার কারু-কর্মীদের একটা ক্লাস থাকবে সমস্ত কাজের সম্পর্কে তাদের আইডিয়া সম্প্রসারিত করে নিজ তুচ্ছ কাজের মূল্যটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্য।—

জুলিয়ান বলেন, তাঁর রাজত্ব হবে 'ন্যাশনাল ব্রেনের' রাজত্ব, এক ধরণের 'ব্রেন ট্রাস্ট'।—তিনি অবশ্য জানেন, মানুষের উন্নতি রাতারাতি হয় না; কিন্তু জোর-কদমেও মানুষ চলতে পারে চালাবার লোক থাকলে।

এসব কথার মধ্যে নূতনত্ব নেই—রুজভেল্ট বা স্টালিনও এমনি সব কথা বলেন এবং এমনি কাজ করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু জুলিয়ান হাক্সলির মত 'বিজ্ঞানবাদ' প্রচার করবার যোগ্যতা তাঁদেব কার-ও নেই, তাঁরা প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। জুলিয়ানেরও প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধি যথেষ্ট—মাঝে মাঝে তাঁর যে দু একটি আইডিয়ার ছিঁটেফোঁটা তিনি উপহার দিচ্ছেন তাতে কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। মনে হয়—'দেওয়া যাক্ না লোকটার হাতে একবার ডিক্টেটরশিপ্'। তাঁর প্র্যাকটিক্যাল পলিসি নির্ধারিত হবে—পরীক্ষা (Experiment) ও নিয়ন্ত্রণ-এর (Control) নিয়ম দ্বারা। দেশ তিনি নানাভাগে ভাগ করবেন; তারপর দেখা যাবে পাশাপাশি পরীক্ষা-চালিত ও নিয়ন্ত্রিত অংশগুলির অবস্থা। ইস্কুলের ছেলেদের দুগ্ধপান, রুটিওয়ালাদের পুষ্টিকর রুটি প্রস্তুত করতে বাধ্য করা, কারখানায় লঙ্গরখানা স্থাপন, রৌদ্রস্নান, বড় বড় কারখানায় খেলাধূলার ব্যবস্থা করা—এই সব হল তাঁর পরীক্ষার জিনিস। আবার, এক একটি দৈশিক ভাগে এমনি পরীক্ষা চল্‌বে মদ্যপান সম্পর্কে। জন্মশাসন সম্পর্কে তাঁর পরীক্ষা হবে দুই ধরনের; এই শাসনের বশে মানুষের উন্নতি যেমন ঘটবে তেমনি শাসন যাতে আত্মহত্যায় পরিণত না হয় তা-ও দ্রষ্টব্য। তাই, একদিকে থাক্‌বে 'ফ্রি ক্লিনিক', অন্যদিকে থাক্‌বে জন্মনিরোধ যন্ত্র ও ঔষধপত্রের বিক্রয় বুঝেসুঝে নিযন্ত্রিত করার ব্যবস্থা। এমনি-ভাবে বাস-সমস্যার (housing problem) সুরাহার ব্যবস্থা হবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করে বাড়িনির্মাণে প্রণোদিত করতে হবে। নগর নির্মাণ সমস্যার সুরাহা হবে—Satellite cityতে। উপ-নগর ও উদ্যান-নগর নির্মাণেই মনে হয়, এর সমাধান। এসব নিয়ে

জুলিয়ান-সাম্রাজ্যে পরীক্ষা চলবে। নগর নির্মাণ সমস্যা নিয়ে জুলিয়ান কম ভাবেন নি—কারণ, স্বাস্থ্য, সুখ, কলকারখানা, সবই পৌর ব্যবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কি হবে—একেবারে নয়া-নূতন শহর? না, বড় শহরের আশেপাশে উপনগর? এই হল প্রশ্ন। দুই নিয়েই পরীক্ষা চল্‌বে। তবে, জুলিয়ান খুব বড় শহরের বিরোধী। যানবাহনের ও পথঘাটের পরিকল্পনাও বেশ কৌতুকপ্রদ। গ্রামকেও তিনি অমনিভাবে গড়ে তুলবেন—যাতে সভ্যতার সমস্ত দান সেখানে করায়ত্ত হয়, এবং অ-সভ্যতার সমস্ত অভিশাপ (যা বড় শহরে আছে) তাও গ্রাম ঠেকিয়ে রাখতে পারে। অর্থাৎ জুলিয়ান শহর, জুলিয়ান গ্রাম দুইই খুব কাছাকাছি এসে যাবে—ছোট হলেও এমন হওয়া চাই যাতে community life গড়ে উঠ্‌তে পারে—অতি ছোট গ্রামে তা' হয় না, অতি বড় শহরেও তা' হয় না। বছর পনের এই সব এক্সপেরিমেণ্ট চল্‌লেই Central Science Council বলতে পারবেন এর কোন্‌টা সার্থক, কোনটা ব্যর্থ।

জুলিয়ান বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ সম্পর্কেও ধরাবাঁধা নিয়ম চালাবেন না। তাঁর আইনের মূলকথা: দুইজনায় চাইলে তখনই বিবাহসূত্র ছিন্ন হবে। কিন্তু,—হ্যাঁ, বিজ্ঞানবাদী জুলিয়ানের রাজ্যেও 'কিন্তু' একটু আছে। সে 'কিন্তু' অবশ্যই মনোবিজ্ঞান-সম্মত। দম্পতির একজন উন্মাদ বা নিষ্ঠুর অমনি কিছু না হলে আরজনকে চাইবামাত্রই পাকা ডিভোর্স না দিয়ে ছয়মাস বা এক বৎসর অপেক্ষা করতে বলা ভালো। কি জানি, মানুষের মন, ক'দিন পরেই আবার উল্টো কাঁদাকাটিও করতে পারে। তা ছাড়া বিবাহের পরে সন্তান না হলে এক বৎসর পর্যন্ত সে বিবাহ Trial marriage গণ্য করা হবে,—'পরীক্ষা-সাপেক্ষ বিবাহ' বা 'চোখে দেখা' বিবাহ ভালো জিনিস।

জুলিয়ানের শেষ চিন্তা—অবসর-সমস্যা। এ বিষয়ে জুলিয়ান নিশ্চয়ই আমাদের specialist বলে মান্‌তে বাধ্য কিন্তু আমাদের

মতামতের অপেক্ষা না করেই তিনি তাঁর দাবাই বাৎলেছেন—"প্রথমেই জেনো—তোমাদের আঠারো বছরের পরে দুই বছর 'দৌড়োতে' বাধ্য করব। সে সময়ে শিখতে হবে ভাবী-জীবিকার কাজ, গড়তে হবে শরীর মন এবং করতে হবে পথ তৈরি, জমি-পরিষ্কার, বন-পত্তন, জল-সরবরাহ, এমনি সব জনহিতকর কর্ম। মেয়েগুলোকে দিয়ে বরং পথতৈরি না করিয়ে creches ও nursery schoolsএ ছেলে তৈরির কাজ শিক্ষা দেব, 'হাতাবাউলির পড়া' পড়াব; খেলার মাঠ চালাতে শেখাব; সেলাইর কল, ক্যান্টিন, ক্যাম্প তাদের দিয়ে চালিয়ে নেব। ভাবী-জীবিকার বাইরেকার কাজের সঙ্গেও ছেলেদের এ বেলাই পরিচয় করিয়ে রাখব। ভাবী দিনের কবিকে দিয়ে এবেলা চরকা-তাঁতের কাজ না করালে পরে সে ছোকরার বুদ্ধি এক-পেশে হয়ে উঠবে। কলেজে যারা পড়বে তারাও এই নিয়ম থেকে রেহাই পাবে না—খুব মেধাবী না হলে অবশ্য কাউকে কলেজের চৌকাঠ পেরোতেই দেব না—প্রথম দফায় ছয়মাস সে ছোকরাদের এভাবে খনিতে, কারখানায় কাজ করাব, মেয়েদের করাব হাসপাতালে বা অন্য কোথাও। দ্বিতীয় দফায় ছয় মাস কাউকে দেব pure research; কাউকে দেশভ্রমণ, কাউকে বৈজ্ঞানিক অভিযান, কাউকে বা নানা সমাজহিতকর কাজের খবরদারি। অর্থাৎ প্রথম দফার উদ্দেশ্য হবে তাদের হাতে কলমে বাস্তব পুঁজি বাড়ানো; দ্বিতীয় দফার উদ্দেশ্য তাদের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে কাজে লাগানো। শুধু কি ছাত্ররা—সমস্ত adult life-এও অবসর যাতে 'ক্ষেপণ' না করে, 'বিনোদন' করা সম্ভব হয়, তার জন্যে আর্ট, কনসার্ট ও মিউজিক হল, Little Theatre movement প্রভৃতি থাকবে; তার সঙ্গে মানুষের সৃষ্টিশক্তির বিকাশের জন্য নানা সুযোগ দেব। কখনো তাদের দেব নিজের শহরকে সুন্দর করবার ভার, কখনো দেব নূতন-করে শহরের জীবন-গঠনের ভার—এক কথায়, এমন কিছু করব যাতে দুনিয়ার উন্নতি ধ্রুব।"

জুলিয়ান-রাষ্ট্রের খসড়া দেখে মন্দ লাগল না—কিন্তু যা তিনি করতে চান শুনছি তাঁর ডিক্টেরশিপ ছাড়াই প্রোলেটেরিয়ান ডিক্টেটর-শিপে তেমনিতর বৈজ্ঞানিক বিন্যাস হচ্ছে, তফাৎ শুধু এই—জুলিয়ান private property একেবারে লোপ করতে চান না,—একেবারে লোপ লেনিনও করেননি। জুলিয়ান নিয়ন্ত্রিত ইকনমিক জীবনের পক্ষপাতী—সোবিয়েত সমাজও তো তাই করেছে। কম্যুনিস্ট সমাজের সঙ্গে জুলিয়ান-রাজ্যের সংস্রব নেই। তিনি বলেন, তাঁর রাজ্য হবে বিজ্ঞানের রাজ্য, তবে সে বিজ্ঞান অনেকাংশে ফলিত বিজ্ঞান। আর তাঁর বিজ্ঞানের রাজ্যে মানুষের values দাম শূন্য নয়।—সোবিয়েত দেশেই কি valuesএর দর বা কদর নেই? অবশ্য টমাস আর্ণল্ডের দৌহিত্রপুত্র ও টমাস হাক্সলির পৌত্রের থেকে এইরূপই প্রত্যাশা করা যায়। সায়েন্সের দুধ ও আর্টসের তামাক দুই তাঁর সমান গ্রাহ্য। বিজ্ঞানের বিজ্ঞতার সঙ্গে হিউম্যানেটিস-এর সংমিশ্রণে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সহৃদয় প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, তাই তাঁর পরিকল্পনায় sanity দেখি এবং অনেকটা চিন্তার ধারের সঙ্গে খানিকটা চিত্তের ভার পাই। অবশ্য, মার্কসিস্ট বলবেন—এ হচ্ছে জুলিয়ানের 'নিউ ডীল'—স্তালিনের 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যান' নয়।—বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবী জুলিয়ান জানেন যে, সাম্যবাদী সমাজই বিজ্ঞানমূলক ও বিজ্ঞান-ধর্মী; কিন্তু বুর্জোয়া জুলিয়ান চান দুদিনেও মুনাফাভোগী শ্রেণীকে টিকিয়ে রাখতে। তাই তিনি সম্মুখে ধরেছেন এই 'জুলিয়ানী ইন্দ্রজাল'।

জুলিয়ানের এই 'ব্রেভ্ নিউ ওয়ার্লড' হয়ত বা তাঁর ভাইএর ব্যঙ্গবিলাসী চিত্রের পাল্টা জবাব। কারণ, এ ঠিক Utopia নয়, এ হচ্ছে সভ্যতার পথের অনিবার্য next step। কিন্তু অলডাস বলবেন, এই জুলিয়ানের পরে আসবে নব-জুলিয়ান, যারা এখনো জন্মেনি। তারপরে আরও ভাবী জুলিয়ান—এক, দুই, দশ। এবং সর্বশেষে বিজ্ঞানের ডিক্টেটরশিপে (প্রোলেটেরিয়ান ডিক্টেটরশিপ নয়),

ফোর্ডযুগে (লেনিন নয়) বোধ হয় আমরা পাব অল্‌ডাস হাক্‌সলির দেখা ব্রেভ্‌ নিউ ওয়ার্লড। কথা তাই এই—মানব-সভ্যতার চরম নিয়তি কি? বিজ্ঞানের আধুনিক সাধনা খুব দুঃসাধ্য জিনিসের জন্য নয়। পরবর্তী stepএ নিশ্চয়ই বিজ্ঞান আরো একটু এগিয়ে যাবে। তারপরে আর এক পা এবং আরও এক পা তারপর। শেষে —সে যুগের জুলিয়ান তাঁর রাজ্যে কি decanted child ও conditioned মানুষ নিয়ে বিজ্ঞানের সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র রাষ্ট্রাধিপতি হবেন? কিন্তু সে হল কল্পনার কথা। তাতে কত কিছু হতে পারে। হয়ত কোনও geological বিপ্লব ঘটে সমস্ত সভ্যতা তলিয়ে গিয়ে রেখে দিয়ে যাবে শুধু আফ্রিকার অরণ্যবাসীদের; ভাবতে পারি ও সব সুদূর কল্পনা-জল্পনাও বাদ দেওয়া উচিত কি? কারণ, কি চাই তা বুঝেই সভ্যতার হাল ধরা দরকার। না হলে চোখ বুজে হাতের কাছের যে-কোনো ডাঙা দেখলে ছুটলে শেষ পর্যন্ত দেখবে যেখানে পৌঁছেছি সেখানে ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমীর—সভ্যতার তরী যেখানে ভিড়ছে সেখানে মানুষের মনের অপমৃত্যু ঘটছে। 'sufficient unto the day' বলে মানব-সভ্যতা দিনগত পাপক্ষয় করে চলতে চলতে এখন চোরাবালুতে আটকে পড়েছে। অতএব, এ সভ্যতার এখনই স্থির করতে হবে "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—Humanitiesএর দেবতাকে, valuesএর মন্ত্রকে, কি বিকাশধর্মী মানব-সত্তাকে? না, মুখে ওসব যা-খুশি বলে —শ্রীঅরবিন্দের সুপারম্যান কিম্বা গান্ধীজীর হিন্দ্‌স্বরাজ—কার্যতঃ চাইব উপকরণ বহুল বস্তু-বৈভব যেমন এখন চাইছি। তাই যদি হয়, তাহলে চোখ মেলে সে পথেই পা বাড়ানো ভালো। আর একটা সংশয়ও আছে—দূর সেই লক্ষ্য বোধ হয় আসলে দুর্লক্ষ্যই। হয়ত উদ্‌বেগের মধ্য দিয়েই তা উদ্‌যাপিত হচ্ছে —জীবনের process এই মানুষের ক্রম-পরিচয়—processএরও শেষ নেই—পরিচয়ের পূর্ণতা নেই। যেই ক্ষণে পূর্ণ তুমি সেই

ক্ষণে নাই। এই বোধ হয় এ জগতের সত্যরূপ। অতএব, এই processটায় যে পাদে আজ এসেছি, সে পাদটাই এখন পূরণ করা ছাড়া গত্যন্তর কি? জুলিয়ানও পাদপূরণ করার কথাই বাৎলাচ্ছেন। কিন্তু যা শুন্‌ছি তা যদি সত্য হয়—এই বাৎলানোর আগেই সম্ভবতঃ এই পাদপূরণ শুরু হয়ে গিয়েছে স্তালিনের মুল্লুকে। জুলিয়ান রাজ্য তার থেকে তফাৎ হবে কিসে? মুনাফা টিকিয়ে রেখে? মুনাফাটা কি সমগ্র মানুষের বিকাশের পক্ষে একটা অপরিবর্তনীয় শর্ত্ত? সে বিকাশের পক্ষে দরকার তো বুঝছি—সায়েন্সের ও হিউম্যানিটিস-এর সমবিকাশের। কি তার রূপ scientific humanism, না socialist humanism? জুলিয়ান ডিক্টেটরশিপ্ না প্রোলেটেরিয়ান ডিক্টেটরশিপ—না, দুয়ের জগাখিচুড়ি অল্‌ডাস্‌ ব্রেভ্ নিউ ওয়ার্লড?

ওয়েলস্-এর "বিপ্লব"

ইতিহাসের মূলতথ্য নাকি মানুষের পরস্পর পরিচয়ের scope, pace ও precision দিয়ে স্থিরীকৃত হচ্ছে। একই মানুষ জাতি ক্রম-বিবর্ধমান—এই হল গোড়ার কথা। বেড়ায় ঘেরা জাতি, বর্ণ, দেশ প্রভৃতির সভ্যতার উত্থান-পতন খণ্ড দৃষ্টিতে দেখলেই দেখতে পাওয়া যায়; পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়—সে-সব খণ্ডপ্রকাশ ও খণ্ডবিকাশের নির্ণায়ক,—রাজা রাজ্য সাম্রাজ্যের পতন অভ্যুদয়ের হেতু; মানুষের বিশ্ববোধের কারণ,—এই 'diastole and systole of population' এর নির্দেশক—আসলে সেই biological truth, scope, pace and percision of human intercommunication একই মানুষের জাতি নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন হয়ে, বিচিত্র হয়ে, আবার আজকাল নিজেদের খুঁজে নিচ্ছে, ক্ষুদ্র থেকে ক্রম-বৃহত্তর unit-এর মধ্যে এসে জমছে, পরস্পরের সংবাদ পেয়ে পুনর্মিলনের পথে মানুষ জাত আবার হতে চল্‌ছে একত্রিত ও এক। ইতিহাসের এই ইঙ্গিত কিন্তু মানুষ এখনো বুঝতে পারছে না—তার চিন্তা এখনো ভাষা, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় ঐতিহ্য প্রভৃতির বেড়া ঘেরা আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে, "man discovers he is nature's misfit." "a monkey alone in a motor-car, terrified and imperilled by the disproportion of his opportunity." চমৎকার H. G. Wells-এর এই উপমা (Manchester Guardian, May 17, 1935. New Deal Everywhere). "It never anticipated the possible

fusions and long-range intimacies that now dismay it." এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তার ধীরগামী মনোজগৎ তাল রাখতে পারছে না। অথচ,—না রাখতে পারলে তার ধ্বংস অনিবার্য। man is today a challenged animal—সে চ্যালেঞ্জ দাবি করে তার পৃথিবীর গঠনের এবং তারও পূর্বে নূতন করে তার মনোগঠনের। মানুষের সামনে Wells-এর মতে এখন তিন সমস্যা : (i) রাজনৈতিক—যার বিভীষিকা war (ii) প্রাচুর্যের মধ্যেকার অভাব—যার লক্ষণ unemployment এবং (iii) Finance capital-এর অসম্ভব বাড়াবাড়ি ও দৌরাত্ম্য। এসবের সামনে আমাদের witless smartness নিরর্থক। বিবিধ বুলি কপচাচ্ছে মানুষ, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। কারণ এই যে, ঠিকমত এই সমস্যাকে বুঝতে গেলে,—এর সঙ্গে যুঝ্তে হলে, আমাদের একদিকে intellectual expansion, বুদ্ধির সীমানা বাড়িয়ে দিতে হবে, অন্য দিকে moral revision, কল্যাণ বোধের সূত্রগুলি নূতন করে শিখতে হবে। অথচ, আমরা কেউ তা করতে প্রস্তুত নই। স্বার্থে, অভ্যাসে, শিক্ষা-দীক্ষায় জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকে এক একটা 'আমার জগৎ' সৃষ্টি করে নিই। আমাদের টান, ঝোঁক, বিরক্তি, অবিশ্বাস সবই সেই যুক্তিহীন জগতের নিজস্ব জিনিস,—নূতন কালের অভাবনীয় চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আমরা সেই স্বভাব ছাড়তে পাড়ি না। অথচ, logic of events এমনি ভয়ানক যে, আমরা বেশ বুঝতে পারছি এ স্বভাবের অদল-বদল না করলেও চলবে না—এই দুই ভাবের দ্বন্দ্বে পড়ে আমাদের অবস্থাটা কি? "Like Pavlov's perplexed dogs man and Governments become hysterical." এই হিস্টিরিয়ারই একটা লক্ষণ হল আত্মপ্রবঞ্চনা দিয়ে আত্মরক্ষা, অর্থাৎ নূতন নামের বার্নিশ দিয়ে পুরানো 'আমার জগৎ'গুলোকে চালিয়ে দেওয়া—তারই নাম হয় New Deal?

"The hysteria of revolution can be extraordinarily like the hysteria of reaction." H. G. Wells-এর মতে বর্তমান রুশ দেশ তারই প্রমাণ।—লেনিনের রুশ দেশ ছিল revolutionary force, সৃষ্টিমাতাল। সে যুগ শেষ হয়েছে প্রথম পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের শেষে। স্তালিনের রুশ দেশ হল dogmatic, স্থিতীকামী; এযুগ চায় আপস-রফা, চলে ভয়ে ভয়ে, it vacillates, imitates, it remembers. ইতালী ও জার্মানীর Co-operative State or Totalatarian State-ও সোভিয়েটের সগোত্র। মানব-সভ্যতার অভ্রান্ত ইঙ্গিতের দিকে পিছন ফিরে তারা একই মুখে যুগোপযোগী আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনের কথা বলে আবার ল্যাতিন বা টিউটন রক্তের জয়গানও গায়! মহা-যুদ্ধে (১৯১৪-১৮) জিতে ফ্রান্স একটু গদিয়ান হয়ে বসেছিল—তাই বেশ স্বচ্ছন্দে কিছুদিন সে বলেছে, "পৃথিবীতে নূতন যুগ কিছুই আসেনি, নূতন কিছুর দরকার নেই।" কিন্তু ৬ই ফেব্রুআরি (১৯৩৪) ও তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে, ফ্রান্সের অবস্থা অন্যের থেকে স্বতন্ত্র নয়। একমাত্র ইংলণ্ড-আমেরিকা এতদিন পর্যন্ত অনেকাংশে modern and futuristic ছিল। কারণ, তারা বরাবর উপ-নিবেশিক অর্থাৎ তারা ক্ষুদ্র গণ্ডি কেটে বৃহত্তর সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। এই জন্যই "Modernity still speaks English or Russian—and it still speaks English best." তাই মানুষের চোখ ফিরে ফিরে তাকায় Westminster-এর বা Washington-এর দিকে—যেখানে freedom of expression and liberty of initiative দিয়ে মানুষ আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভাষাও এক, ইডিয়মও এক। একটি ইংলিস-speaking synthesis খুবই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়—এইসার সত্য বুঝে ওয়েলস্ সাহেব স্তালিনের রুশিয়া থেকে ফিরে যান রুজভেল্টের আমেরিকায়। দুটা জিনিস সেখানে তাঁর প্রথম

চোখে পড়ল : (১) 'নিউ ডীলের' পক্ষবিপক্ষ কোনো সমালোচনাকে সরকার চাপা দিচ্ছে না। রুশ দেশে স্বাধীন সমালোচনার স্থান নেই, ইংলণ্ডে আছে তার মুখোশ ; কিন্তু আমেরিকায় তার প্রকাশ অকুণ্ঠিত। (২) Class war বা Xenophobia বা anti-Jewish অত্যাচার প্রভৃতি কোনো কুৎসিত হিংসার দৃশ্য আমেরিকার নিউ ডীলে চোখে ঠেকে না।

ওয়েলস-এর লেখাটা বাক-কৌশল ও চিন্তা-কৌশলে পূর্ণ। লিখতে বসেছেন 'নিউ ডীল' সম্পর্কে ; কিন্তু চমৎকার করে উদ্‌ঘাটন করে ফেল্‌লেন একটি দফায় এই New Deal, Planned Economy, আধুনিক জগতের Politico-Economic দুরবস্থার মূল কারণ—তাঁর মতে যা Fundamental problem তা। ওয়েল্‌সের মূল ফিলজফি এই যে, মানব ইতিহাস এবার মহামানবের ইতিহাস হচ্ছে। কিন্তু এ যুগে পাশাপাশি Communist Internationalism ও Fascist Corporative Stateএর ঢক্কানিনাদ শুনে আমাদের বুদ্ধি যে puzzled.—ওয়েল্‌স বলছেন, ও-দুয়ে তফাৎ নেই ; দুইই এগোবার নামে পিছানো ;—দোমনা হয়েছে বলেই দুদল এমন আত্মছলনা করছে। আর দোমনা যে হয়েছে তাতেই প্রমাণ তার ক্ষুদ্র-গণ্ডির মনের উপর তার বৃহত্তর পৃথিবীর ও মানবের ঐক্যবোধ স্পষ্ট হয়েছে।

এই চমৎকার প্রখর-উজ্জ্বল লেখার পিছনে অন্তত একটা সত্য আছে, মানুষ আজ দোমনা—মায় H. G. Wells পর্যন্ত। Fascistরাই শুধু হাস্যকররূপে দোমনা-বৃত্তির পরিচয় দেয় না, Fabianরাও দেন। ওয়েলস লেখেন—'স্তালিনের রুশও তাই'। দোমনার জগতে স্তালিন কি সত্য সত্যই হিটলারের সগোত্র ? কিসে—দুজনার গোঁফ আছে বলে ? আসলে পুরনো মালিকদের ফ্যাসিজিমের পথে এই আত্মরক্ষার উৎকণ্ঠতায় কম্যুনিজমের ধ্বংসবীজ উপ্ত হচ্ছে না তা সাহস করেই বলা চলে। ওয়েলস্ সাহেবও

যে দোমনা তাতে সন্দেহের কারণ নেই। তাঁর মানব-ঐক্যের স্বপ্ন, সোসালিজমের স্বপ্ন, Class war-এর ঘা খেলে বা 'স্বাধীন মত' প্রকাশের অসুবিধা থাকলে, এক নিমেষও টেকে না। মনের এই দ্বন্দ্বের জন্যই তিনি চান যে, Economic crisis-এর সাপ মরুক কিন্তু Capitalismএর লাঠি যেন না ভাঙে। তাই তিনি 'নিউ-ডীল' এর ওপর খুব ভরসা রাখেন। এদিকে অনেকদিন সোসালিজম-এর ইস্কুলে মানুষ হয়েছেন, ফ্যাসিস্ত পদ্ধতির সর্পযজ্ঞও তাই তাঁর ভালো লাগে না—যদিও লাঠি তাতে সর্বাংশে রক্ষা পায়। ওয়েলস-এর মনের দ্বন্দ্ব কিসে কিসে? তাঁর Intellectual দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর আরামপালিত বুর্জোয়া liberal মানসিকতার; বর্তমান ধনিক সভ্যতার বিশেষ একটা লক্ষণই এই যে, তার শ্রেষ্ঠ চিত্তগুলি আত্মসংগ্রামে হয় উন্মত্ত, নয় খণ্ডিত। ক্যাপিটালিজম-এর এই শেষপাদে সভ্যতার এই ছিন্নমস্তা-রূপ অপরিহার্য—তাই, Fabian-Socialist ওয়েলস সাহেবের এই দশা। চতুর মানুষ তিনি, হিস্টিরিয়াটা গোপন রাখতে পারেন—না হলে তাঁর দশাও Pavlov's dog এর অনুরূপ।

একটা মজার কথা—ওই 'English-speaking synthesis'. ওটা আমেরিকার তোয়াজ? না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের—বর্ণ চোরা নাম?

এ যাত্রায় A. I. Toynbee-র Survey of International Affairs (1920-23) আর পড়া হল না,—অনেকদিন পূর্বে এ বই আমার উল্টানো আছে। (এখন এ বই পড়ছেন একটি পলিটিক্সের এম-এ পরীক্ষার্থী)। আমি চেয়েছিলাম 1933-এর নূতন বালাম; কিন্তু লাইব্রেরি তা এত শীঘ্র আমাদের দিতে নারাজ। Delisle Burns-এর A Short History of the World (1918 1928--Gollancz) তাড়াতাড়ি উল্টে গেলুম। পুরানো পড়া যেমন নোট-এর সাহায্যে recapitulate করা যায় এ বই-এর সাহায্যে অনেকটা তাই করা গেল। তবু বার্ণসের বইখানা চমৎকার। কিন্তু ব্যাচারী বার্ণস। ১৯১৮ সনে তিনি ভেবেছিলেন দুনিয়া বুঝি যুদ্ধান্তের আর্থিক সঙ্কট পেরিয়ে ও জাতি-বিদ্বেষের বিস ঝেড়ে এক নূতন অধ্যায়ের প্রারম্ভে এসে পৌঁছেছে; অবশ্যই তাঁর শেষকথাগুলি খুব Cautious League সম্বন্ধে, International cooperation সম্পর্কে, Peace সম্পর্কে, কিন্তু তিনি বলশেভিক নেপ-নীতিতে কম্যুনিস্টিক জবরদস্তির পরাজয় দেখে খুশী; জর্মনীতে Social Democrats-এর নিশ্চিন্ত প্রতিষ্ঠায় উৎফুল্ল, দিকে দিকে তিনি দেখছেন Liberalism, Democray এবং নবপ্রসূত আন্তর্জাতিকতার সুস্থির জয়যাত্রা—in spite of Mussolini or Primo de Rivera. আর পাঁচ বছরের মধ্যেই কোথায় ভেসে গেল সেই অলীক prosperity-র যুগ, সেই জর্মন Social Democracy ও ভাইমার রিপাবলিক; সেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ভাই-বিরাদরি! বাস্তবিক বর্তমান কালকে বুঝা শক্ত। তবু বার্ণসের বইখানা ভালো—ওই কয় বৎসরের

সুন্দর একটি চুম্বক। অত তাড়াতাড়ি না উল্টালেই ভালো হত। কিন্তু আমার উপায় নেই—হাতে এসে পড়েছে আর-একখানা বই। শতখানেক পাতার হলেও তার দাবি কম নয়। ভাসা-ভাসা তার সূত্রগুলি জানা থাকলেও তা না-পড়ে এবারকার মত ভাসিয়ে দেওয়া চলে না। বইখানা পুরনো—সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের The Future of an Illusion. ঝড়ের মত বেগে বইখানার পাতা উল্টে যাচ্ছি। সুখপাঠ্য না হলেও ফ্রয়েডের লেখা যে সাধারণতঃ বুদ্ধির ইস্পাতে শান্ দেওয়া তা পূর্বেও দেখেছি। এ বইখানা কিন্তু পড়তেও মন্দ লাগ্ছে না। ফ্রয়েড কালচার বলতে বুঝেন—সেই সব জিনিস যার বলে মানুষ পশুর জীবন থেকে উপরে উঠেছে। তার দুই দিক—(১) যে শক্তি ও জ্ঞানবলে মানুষ প্রকৃতিকে পরাজিত করে নিজের প্রয়োজনার্থে তাকে কাজে লাগাচ্ছে, এবং (২) যে ব্যবস্থা-বলে মানুষ নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও প্রকৃতির লুঠকরা ধনদৌলত বণ্টনের কাজ পরিচালনা করছে;—এবং এই দুই দিক যে পরস্পর নির্ভরশীল তা না বললেও চলে। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে এই কালচার বহন করছে অনিচ্ছুক জনসমষ্টি; তা চালনা করছে পীড়ন সমর্থক মুষ্টিমেয় লোক। এ অবস্থা বদ্লাবে কি না-বদ্লাবে, পারিপার্শ্বিক বদ্লালে মানুষের মন কি পরিমাণে বদ্লে যাবে, এসব প্রশ্ন অবশ্য এ যুগের প্রধান প্রশ্ন। কিন্তু তা আপাততঃ বিচার না করলেও চলে—ফ্রয়েডের মতে অন্ততঃ। বর্তমানে যা প্রত্যক্ষ তা এই যে, মানুষের সভ্যতার ভিত্তিতে আছে (এক পক্ষের?) coercion দণ্ড, (অপর পক্ষের?) instinctual renunciation ত্যাগ। ফ্রয়েড অবশ্য পক্ষ-প্রতিপক্ষ কথাটা উত্থাপন করেন নি; করলে তিনি মার্কস হয়ে উঠতেন। দণ্ড না হলে যে চলে না ফ্রয়েডের মতে তার প্রধান কারণ,—men are not naturally fond of work, and arguments are of no avail against their passions. ফ্রয়েডের এই নির্মম বিশ্লেষণ যে সাধারণভাবে সত্য তা অস্বীকার

করবার পথ আছে ? অথচ একথাও তো ঠিক—প্রাণের লক্ষণই হল তা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না—pleasure principleকে প্রাণের মূল মানলেও মানতে হবে কর্মনাশে pleasure নেই। যাই হোক ফ্রয়েডের মতে সমস্যা তাহ'লে দাঁড়ায় এই : (১) মানুষের প্রবৃত্তি-সংযমের (instinctual renunciation) বোঝা কতটা লাঘব করা যায়; (২) এই প্রবৃত্তি-নিরোধের সঙ্গে প্রবৃত্তি-মুক্তিকে মোটেই খাপ-খাওয়ানো সম্ভব কি না; এবং (৩) যতটুকু নিরোধ আবশ্যক তার বিনিময়ে কি ক্ষতিপূরণ বা সান্ত্বনা মানুষকে দিতে হবে ?—এই শেষ কথাতেই ফ্রয়েড দেখলেন psychical sphere of culture (যে কালচারের ভিৎ হল জড়বস্তু ও জড়বস্তুর বণ্টন); এবং শুরু হল ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ যাতে শেষ পর্যন্ত religion গণ্য হয় একটা প্রয়োজনীয় illusion রূপে।—ভাবী অবস্থা হল সন্ধানের জিনিস। কিন্তু নিরোধের অন্যান্য রূপ থেকেই এই ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ শুরু করা যাক্ :—

কতকগুলি নিরোধ আছে যা সবারই উপর প্রযোজ্য, আবার কতকগুলি শুধু ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের উপর খাটে। সকলের যে-সব নিরোধ মানতে হয় তা সুপ্রাচীন; সেই নিষেধাজ্ঞা থেকেই কালচারের শুরু। এগুলি হচ্ছে : অগম্যাগমন, নরমাংসাহার ও নরহত্যা। এগুলি সম্বন্ধে মানুষ একমত। কারণ, এককালে যদি বা এগুলি ছিল বাইরের চাপানো নিষেধ, আজ এগুলো হয়েছে আমাদের ভিতরের অন্তরাত্মা। এখানে একবার থেমে একটু জিজ্ঞাসা করতে হয়—ফ্রয়েড এমন একটি কথা বলেছেন যা সচরাচর তাঁর বুলি যাঁরা কপ্‌চান তাঁরা ভুলে যান। সে কথাটি হচ্ছে তাঁর অধুনা-স্বীকৃত super-ego বা 'বিবেকের' কথা। এই বিবেকও মানুষের 'মনের ধর্ম'। শুধু 'কাম'ই নয়, সংযমও তার স্বধর্ম। দুয়ের টানা-পড়েনেই মন। আবার, এই মন জিনিসটি তাহলে একটা ঢালাই করা জিনিস নয়। সেও চলছে, বদলাচ্ছে। তাই বাইরের (সামাজিক ?) নরমাংস

ভোজনের নিষেধ হয়ে ওঠে অন্তরের (বিবেকের ?) আদেশ ; অবশ্য তা হয় super-egoর প্রসাদে। এই পরিবর্তনের দৌলতেই মানুষ হয় moral and social being. ফ্রয়েডীয় ভাষাটা এই : "It is in accordance with the course of our development that external compulsion is gradually internalized, in that a special mental function, man's super-ego, takes it under its jurisdiction." এই incest প্রভৃতি আদি-নিরোধ-গুলি অবশ্য অন্তরাজ্ঞা হয়ে উঠেছে, কিন্তু এসব ছাড়লেই দেখি, অন্য কতকগুলি নিরোধ যা মানুষ মোটেই সহজে স্বীকার করতে চায় না। যেমন, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যে, এমন কি কামেও (যা নিতান্ত incestuous নয়) অনেক সভ্য মানুষের দারুণ প্রবণতা দেখা যায়—যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কেউ না ঠেকায় বা ঠ্যাঙায়।

যে সব নিরোধ শ্রেণী-বিশেষের উপর প্রয়োজ্য, বলা বাহুল্য, সেগুলো অন্তরাজ্ঞায় পরিণত হতে পায় না। তাই এইরূপ 'নিরুদ্ধ' শ্রেণী হয়ে ওঠে অনিরুদ্ধ শ্রেণীদের উপর খড়্গহস্ত। তারই ফলে সমাজে অবশ্যম্ভাবী শ্রেণী-সংঘর্ষ দেখা দেয়। কালচারের এক বাঁচোয়া হল বহিরাজ্ঞাকে অন্তরাজ্ঞায় পরিণত করায় (যার নাম moral sense)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাঁচোয়া হল তার আইডিয়াল ও আর্ট।

আর্টের মানে কি ? সে কথা পরে হবে, কিন্তু আদর্শ এল কি করে ? ফ্রয়েড বলবেন, ভিতরের সামর্থ্য ও বাহিরের (প্রাকৃতিক) অবস্থার সহযোগিতায় কোনো-একটা কাজ একবার সুসাধ্য হয়ে উঠলেই মানুষ সেই কাজটিকে ধরে নেয় তার আদর্শ বলে (ideals are modelled on the first achievements that the co-operation of internal ability and external circumstances made possible.) তখন থেকে এইটাই অনুসরণ করা হয় তার কাজ।—তাতে তার আত্ম-গরিমা (of narcissistic

nature) তৃপ্তি পায় ; অন্য কালচারের অন্য আদর্শকে সে ঘৃণা করে। এমন কি সমাজে যারা ক্ষুদ্র তারাও শেখে এই সমাজের বড়দের আদর্শকে নিজেদের আদর্শ বলে মনে করতে, ও অপর সমাজের আদর্শকে ঘৃণা করতে। ফলে, শ্রেণী-সংঘর্ষও কতকাংশে এরূপ (সঙ্কীর্ণ সমাজের) আদর্শগত ঐক্যবোধের দ্বারা নিরস্ত করা যেতে পারে। (ফ্রয়েড বলেন নি, কিন্তু Fascism জিনিসটাই যে তা, একথা ইহুদীনিসূদন ফ্যুহ্রারকে দেখে কে মনে না করবে ?)

আর্টের থেকে অন্যরূপ ক্ষতিপূরণ লাভ করা যায়। প্রথমতঃ আর্ট সেই আদি-নিবোধের গোপন কামনাগুলিকে (incest, murder, cannibalism) অজ্ঞাতসারে পূজা ও নৈবেদ্য দেয়— এমনভাবে দেয় যে তা কেউ সন্দেহ করে না। দ্বিতীয়তঃ আর্টের সহায়ে শুধু শিল্পীর নয়, পাঠকের, দর্শকের, শ্রোতার বলিষ্ঠ ভাবানু-বেগ জড়িত ওরূপ বর্ণচোরা অভিজ্ঞতা লাভ হয়, এবং সকলের feeling of identification (একাত্মতা) বর্ধিত হয়। যথা, হ্যামলেটের,—ম্যাকবেথের সঙ্গে দর্শক একাত্ম হয়ে কতকগুলো জোরলো আবেগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাতে ভাবাবেগ তৃপ্ত হয়। অ্যারিস্টটলের উক্ত Kathersis কি তাই ? আরও মজা, আর্টকে যদি আবার জাতের বড়াইর বিষয় করা যায় (ন্যাশনাল আর্ট), তাহলে তার থেকেও আত্ম-গরিমা (narcissistic gratification) পরিপুষ্ট হতে পারে। কিন্তু আর্ট বা আইডিয়াল এসবের থেকে ঢের বেশী জোরালো ছলাকলাও আছে—তা 'ধর্মের ধারণা',—যে illusion হচ্ছে 'perhaps the most important part of the psychical inventory of a culture.' কালচারের সব চেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে এই ধর্ম।

তা হলে এবার প্রথমে জানতে হয় : রিলিজিয়াস্ আইডিয়ার বিশেষ মূল্যটা কিসে ?

"For the individual, as for mankind in general,

life is hard to endure". এই হল Freudএর মূল ধারণা। প্রকৃতি খানিকটা বশীভূত হলেও অনেকাংশে অপরাজিতা। হঠাৎ বাসুকীর মাথা নড়ে উঠ্‌ল, কোয়েটায় পঁচিশ হাজার এক নিমেষে সমাধিলাভ করলে। কোথায় হল বর্ষণ, ভেসে গেল বর্ধমানের চাষীদের কুঁড়ে। এল উনপঞ্চাশ পবন, আটলান্টিকের এপারে-ওপারে ইস্পাতাবাস ধূলিসাৎ হয়ে গেল। প্রকৃতির এ খেয়ালকে আমরা নিয়তি নাম দিয়ে কোনোরূপে নিজেদের প্রবোধ দিই। কিন্তু কোথাও বাধল যুদ্ধ আর মরল হাজার কয় লোক তার ফলে—এও তো প্রায় দৈববিড়ম্বনাই।

ফ্রয়েড অন্যান্য দুঃখের কথাও জানেন—এইসব আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুর্দৈব ছাড়াও দুঃখ আছে। আর তাইতো মূল দুঃখ। মানুষের কালচারের বিধিনিষেধগুলি তার পক্ষে দুর্বহ,—এটাই ফ্রয়েডীয় মতবাদে আধ্যাত্মিক দুঃখ।

এই 'ত্রিবিধ দুঃখাৎ অত্যন্ত নিবৃত্তি'র জন্য মানুষের শিশুমন চাইলে কোনো সহজ ছলনা—কালচারের কাজই হল তা যোগানো। মানবজাতির শৈশবে 'পিতা' একাধারে ভীতির ও সংরক্ষণের বস্তু ছিল, তারপরে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে অসহায় মানবসন্ততি তাকে করে তুল্‌লে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসার পাত্র। মনে রাখতে হবে, অসহায় শিশুর আত্মরক্ষার ইচ্ছাই প্রধানতঃ এর মূল। তেমনি ধর্মবোধের শৈশবে নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতির দারুণ আঘাতে ভীত হয়ে, ত্রস্ত হয়ে অসহায় মানুষ সেই প্রাকৃতিক শক্তিকে পিতার মত বলে কল্পনা করে নিলে—এই আশায় যে পিতার মতই সে শক্তি তাকে সংরক্ষণ-ও করবে,—শুধু সংহারই করবে না। অবশ্য, এ হল য়িহুদী ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ—যাদের কাছে ভগবান শুধুমাত্র 'পিতা'। খৃষ্টানরা সেই শক্তিমান পিতৃদেবকে আবার একটু স্নেহময় বলে কল্পনা করলেন—আজকের সমাজে যেমন ছেলেরা পিতাদের ভেবে থাকে—স্নেহ-প্রবণ অভিভাবক সুহৃদরূপে। কিন্তু আমাদের কাছে জগৎপিতার

অপেক্ষাও জগন্মাতার ধারণাটা বেশী সহজ। মহাকাল অপেক্ষা মহাকালী আমাদের নিকট বেশী নিকটের। আবার, সেই কালী করালবদনী-ও হয়ে উঠেছেন দয়াময়ী। অবশ্য mother-goddess cult-ও আমাদের একচেটিয়া নয়! মহেঞ্জদড়ো থেকে শুরু করে সুমার-ব্যাবিলন ও মিসর-ইজিয়ান্ উপকূলেও সেই আদ্যার বা মহাদেবীর সাক্ষাৎকার মিলে। ফ্রয়েড ভগবানে পিতৃত্ব আরোপের কারণ দেখিয়েছেন, 'মাতৃত্ব' আরোপ কোন্ ধারণায় করা হয় তা বলেননি। নৃতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের প্রসাদে অনেকের তা বোঝা অসম্ভব নয়। সমাজে পিতৃকর্তৃত্ব ও মাতৃকর্তৃত্বের বিভিন্ন যুগ এসেছিল। পিতৃপ্রধান সমাজে ভগবৎকল্পনা হয় পিতৃ-আধারে, আর মাতৃপ্রধান সমাজে হয় মাতৃ-আধারে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব কি বলবে? শত্রু থেকে পিতা মিত্র হলেন, তাই বিরুদ্ধ প্রকৃতিক শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ পাৎবার এই একটা কৌশল—এইরূপে তার উপর পিতৃত্ব আরোপ। কিন্তু মাতা তো কোনকালে মানবসন্ততির কাছে শত্রু ছিলেন না, অন্তত তাই আমার জ্ঞান, তাহলে বিরুদ্ধ শক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছিল কেন? প্রকৃতির উৎপাদন শক্তি দেখে? সর্বপ্রসবিনী বলেই কি প্রকৃতি নারীরূপে কল্পিতা হলেন? তারপরেই জগদ্ধাত্রী, জগন্মাতা, সন্তান সংরক্ষণে সদানিরতা? একটু বাঁকিয়ে যদি কেউ বলে—ধনোৎপাদনকেই সারাৎসার, অতএব ধনোৎপাদনকে কেন্দ্র করেই মানুষের কল্পনা পল্লবিত হয়েছে। তারই প্রতীক হিসাবে জনোৎপাদিনী নারী হলেন পূজ্যা। যখন পর্যন্ত বিশেষতঃ সমাজেও তিনি ধনোৎপাদনের কর্মে নগণ্য হয়ে যান নি। এই বিষয়ে ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ জানবার উপায় দেখছি না। যাক্ ফ্রয়েড ভাষ্যেও 'পরমপিতা'র কাজ হল এই: প্রথমতঃ প্রকৃতির সংহার লীলাকে নিবৃত্ত করা; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নিয়তির দুর্বার বিধান মেনে নিতে শেখানো; তৃতীয়তঃ, আমাদের সভ্য-সমাজে যে নিরোধ আমাদের স্বীকার করতে হয় তার খানিকটা

ক্ষতিপূরণ দেওয়া। অবশ্য এই হল সমাজের গোড়ার দিকে ভগবৎ-কল্পনা। সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, নানাদেশে চিন্তা সেই মূল ত্রিবিধ-দুঃখের তাড়নায় নানা রূপ নেয়—এমনকি শেষে হয়ে ওঠে 'সচ্চিদানন্দ'।

একটা কথা তবু মনে হয়, ফ্রয়েড খৃষ্টান জগতের ভগবৎ-ধারণাকেই বিশ্লেষণ ও বিতাড়ন করতে বসেছেন এবং তাদের রিলিজিয়নের নিয়ম-কানুনই হল তাঁর আক্রমণের বিষয়। ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি, এবং আমাদের ধারণায় অধ্যাত্মবোধ যে-বস্তু, ফ্রয়েডের আক্রমণ থেকে তা রেহাই পায় না; কিন্তু ফ্রয়েডের অনেকটা আক্রমণই তাকে বিঁধে না, এ-ও সত্য। ফ্রয়েডের মোট কথা—ধর্মবোধের মূলে গেলে দেখা যায় তা একটা illusion (ছলনা? ফ্রয়েড বলেছেন, illusion শুধুমাত্র একটা wish fulfilment; delusion অ-স্বাভাবিক ও অ-সম্ভব; illusion তা না হতেও পারে, তবে তা কাল্পনিক, বাস্তব নয়, এটি স্মরণীয়।)

ধর্ম তাহলে প্রকৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এবং আপনার অসম্পূর্ণতা ঢাকবার জন্য মন এই মায়াজাল বিস্তার করেছে। এ মায়াজালের কি এখন আর দরকার আছে? ফ্রয়েড বলেন, নেই। কারণ—হায়, এবার ফ্রয়েড যা বললেন তা নিতান্ত commonplace—কোমর বেঁধে তিনি তর্কে নামলেন যাঁরা ধর্ম-বোধের এই মূল গবেষণায় আপত্তি করে তাঁদের সঙ্গে। খণ্ডন করতে বসলেন তাঁদের যুক্তি। দেখাতে গেলেন—তাঁর Totem and Tabooতেও তিনি এই ambivalence-এর কথা বলেছেন যা প্রত্যেক ধর্মেই আছে,—ভক্তি আর ভয়ের দ্বন্দ্ব, সংহার ও ত্রাণের সমন্বয়-প্রচেষ্টা। দেখালেন যে ধর্ম সমাজ-প্রগতির পক্ষেও সাহায্য অপেক্ষা ক্ষতি করেছে বেশী। হাসলেন দেখে যে মানুষ সবক্ষেত্রে যুক্তি মেনেও ধর্মের কথা উঠলেই দোহাই পাড়ে আপ্ত-বচনের, দোহাই দেয় মুনিঋষির, Ecstasyগ্রস্তদের অভিজ্ঞতার।

স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ধর্ম-বিশ্বাসে আজ আর সমাজের বুদ্ধিমানদের আস্থা নেই, কাজেই ওতে আর ছলনার কাজও চলে না। ধর্মের কাহিনী শুনে কেউ খুন-জখম থেকে বিরত হয় কিনা ঠিক নেই, কিন্তু সে বিষয়ে 'ধর্মের কাহিনীর' থেকে সমাজের উদ্যত দণ্ড যে বেশী কার্যদায়ক তাতে সন্দেহ নেই, ইত্যাদি। ধর্ম জিনিসটি সভ্যতার বিকাশের একটা স্তরে এসেছিল—তার শৈশবে,—যেমন মানুষমাত্রেরই শৈশবে আসে একটা সময় যখন অনেক সহজাত-বৃত্তিকে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে সে সেগুলো অবদমিত করে—anxiety motive তাকে এ-কাজে তাড়না দেয়, দেখা দেয় কতকগুলো শিশুসুলভ obsessional neurosis: এসব শৈশব-neurosis আবার আপনা-আপনি চলে যায়। ধর্মও মানবের শিশু-সভ্যতার যুগের তেমনি একটি neurosis—যখন মানুষ ছিল শিশুর মত অজ্ঞান, অবোধ,—তখন তার দরকার হয়েছিল সভ্যতা-সংরক্ষণের জন্য এইরূপ ভয়-হতাশা প্রভৃতি বৃত্তির অবদমন। "Thus religion would be the universal obsessional neurosis of humanity. It, like the child, originated in the Oedipus complex, the relations to the father." মানব-সভ্যতার শৈশব উত্তীর্ণ হলেই এই ধর্মের neurosisও অবসান লাভ করবে। এই neurotic survival-এর পরিবর্তে ফ্রয়েড প্রবর্তন করতে চান science-এর সত্য আলো—psycho-analysis মানুষের রোগ ছাড়ায় 'সত্য' উদ্‌ঘাটন করে। তাই psycho-analysis-এর গুরুর মতে, scienceই মানব-মোহ অপনোদনের একমাত্র পথ। ফ্রয়েড গোঁড়া নন, বলেন, science-এর এ শক্তি আছে কিনা তা একবার পরীক্ষা না করতে তিনি হাল ছাড়বেন না। যদি পরীক্ষায় science ফেল মারে, তাহলে অবশ্য তিনি আর science-এর হয়ে ওকালতি করবেন না। তবে যেমন ছলনা করে ছেলে ভুলিয়ে রাখ্‌লে দেখা যায় ছেলেদের ক্ষতি হয়,

তেমনি ধর্ম নামক ছলনায় মানুষকে ভুলিয়ে রাখাতেও মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এখন সত্য উদ্‌ঘাটন করাই হল প্রকৃষ্ট। রিলিজিয়ন বা অন্য ছলনায় চলবে না,—science দেবে সত্য এবং চাই এখন সত্য। "No, science is not illusion but it would be an illusion to suppose that we could get anywhere else what it cannot give us." অতএব, এখন

"Let us leave the heavens
To the angels of the sparrows."

বই শেষ করে ভাবছি, ফ্রয়েডের এই ওকালতিতে নূতনত্ব কোথায়? ধর্ম যে দেউলে এতো আমরা অনেকেই বুঝি। তা নিয়ে বহুপৃষ্ঠাব্যাপী তর্ক—অত্যন্ত মামুলী তর্ক করে কী লাভ? মানুষের ধর্মবোধকে ছলনা বলে আমরা তো টিটকারি দিই। আমরা যে-সব যুক্তির অবতারণা করি ফ্রয়েডসাহেব তার থেকে একটিও বেশী ভালো যুক্তি দেখাতে পারেন নি। কিন্তু যুক্তিই কি এক্ষেত্রে যথেষ্ট?

পৃথিবী থেকে, মানুষের মন থেকে, ধর্মের বিষ ঝেড়ে ফেলবার পক্ষে এই কি যথেষ্ট? আমার মত সংশয়বাদীও নিঃসংশয় হতে পারে না। অথচ জানি ধর্মের উকীলদেরও যুক্তি শেষ পর্যন্ত এই যে (যে রাধাকৃষ্ণণ-এর অমন চমৎকার বই Idealist view of life) মানুষের অন্তরে নিগূঢ় রয়েছে একটি অনুভূতি যাতে সে পরমার্থ না পেলে খুশী হতে পারে না। এই 'মনের নিগূঢ় অনুভূতি' যে অনেকাংশে ভয় বিস্ময়ের (i.e., অসহায়তাবোধ অর্থাৎ দুঃখবোধের থেকে পরিত্রাণের) তাগিদে সৃষ্টি, তা-ও বুঝি এবং তা বুঝলেই ফ্রয়েডসাহেবের বক্তব্য আসলে মানা হল। রাধাকৃষ্ণণের বক্তব্যকে ফ্রয়েডের খোঁচায় ঘায়েল করা কঠিন নয়। কিন্তু 'মরিয়া না মরে রাম'—রাধাকৃষ্ণণদেরও কথা মতই উড়িয়ে দেওয়া যাক শেষ পর্যন্ত তবু যেন আবার জমাট বেঁধে উঠে—অন্তত 'আমাদের মত'

লোকদের কাছে। তার একটা কারণ বোধহয় আমরা এখনো illusion চাই এবং ধর্মের কোনো substitute দেখি না। ফ্রয়েড বলছেনঃ আছে, তা সায়েন্স! কিন্তু যে-যুগে জিন্‌স, এডিংটন, প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দে বিজ্ঞানের অভাব ঘোষণা করে পরাবিদ্যার স্মরণ নিতে বলছেন, সে-যুগে ফ্রয়েডের একথায় কি আমরা হাসব না কাঁদব? মজার জিনিস এই—Marxistরা হচ্ছেন Freudianদের পরম শত্রু। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ও বিজ্ঞান-ভক্তিতে দু'দলের মধ্যে এক অপরূপ মিল।

পুনশ্চঃ Mother-Goddess cult সম্বন্ধে Freud-এর আলোক মিলল ঃ

The libido follows the type of Narcissistic needs—attaches itself to types that ensure this satisfaction. So, the mother who satisfies hunger, become the first love-subject, and certainly the first protection against all the undefined and threatening objects of the outer world, becomes as it were, the first protections against anxiety." (P. 41.)

অতএব, মানব-সমাজে Mother-Goddess cult হয়ত God the Father-এরও পূর্বে জন্মেছিল, যেমন মাতার প্রতি ভালোবাসা জন্মে পিতার প্রতি ভক্তির অনেক পূর্বে। এ বিষয়ে Marxist মতবাদ কি? সম্ভবতঃ এরূপ, Father-God যেমন Patriarchal societyর সৃষ্টি, Mother-Goddess তেমনি Matriarchal societyর সৃষ্টি। Matriarchal society আবার ধনোৎপাদনে ও জনোৎপাদনে নারীর প্রাধান্যেরই ফল ও প্রতীক। যাই হোক্ —সমাজশক্তি যাঁর হাতে তাঁরই image-এ তৈরী হলেন দৈব ও দেবতা। কিন্তু মাতৃমূর্তি যত পূজা পেলেন ভারতবর্ষে, তিব্বতে পেলেন না কেন? অন্যান্য মাতৃশাসিত বর্বর সমাজেই বা তাঁর প্রতিষ্ঠা কিরূপ?

অবসরের ভার

'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান অ্যাণ্ড দি নেশন্' আমি পড়ি না আজ (১৯৩৫, প্রেসিডেন্সি জেল) তিন বৎসর। সে-পত্রে Y. Y. (রবার্ট লিণ্ড) প্রায়ই সরস নিবন্ধ লিখে থাকেন। (ইংরেজীতে যাকে Essay বলে আমি তাকেই বল্‌ছি নিবন্ধ—বন্ধন যার নেই এই অর্থে।) সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে বোধহয় শব্দটা হবে নির্বন্ধ; কিন্তু বাঙ্‌লায় আমরা 'নিবন্ধ' বলতে পারি না কি? রবীন্দ্রনাথের 'অবন্ধ' কথাটা আমার কাছে অচল ঠেকে বলেই আমি পুরনো নিবন্ধ শব্দটিতে একটু রস মিশিয়ে এই নতুন অর্থে প্রয়োগ করা মন্দ মনে করি না। Essay-কে বলছি (স)রস-নিবন্ধ। কখনো-কখনো 'লিডারের' (এলাহাবাদের দৈনিক) উদ্ধৃতিতে Y. Y. বা ওরূপ কারো ইংরেজী Essay পড়ে জেলখানায়ও এক-আধটু তার রসাস্বাদন করতে পারি। আজকের স্টেট্‌স্‌ম্যান Y. Y.-র তেমনি একটি রস-'নিবন্ধ' নিয়ে একটি নয়া নিবন্ধ তৈয়ারি করে ফেলেছে—'টাইম্‌সের' থার্ড লিডারের দৃষ্টান্তে। মূল নিবন্ধটিতে Y. Y. বলছেন যে, মানুষের অবসর বেড়ে যাচ্ছে, ন্যাশনাল প্ল্যানিং-এর দিকে লোক এগোচ্ছে, ক্রমে তা আরও আয়ত্ত হবেই। তখন দেখা যাবে যে প্রচুর অবসর মানুষের জুটছে। কি করে সে অবসর বিনোদন করা যাবে, আজকের মানুষের এখন থেকেই তা ভাবা উচিত। এখন থেকে সুব্যবস্থার সূত্রপাত না করলে পরে যে মানুষ তখন অবসরের তাড়নায় পাগল হয়ে যাবে।—এই কথার সূত্র ধরে

স্টেট্‌স্‌ম্যানের লেখক বলছেন যে, মিথ্যা নয়। প্ল্যানিং-এর দৌলতে যখন উৎপন্ন বস্তুর বণ্টন যথোচিত হবে, আর র‍্যাশেনালিজেশনের ধাক্কায় যখন শ্রম-লাঘব যন্ত্র বহু মানুষকে দিনরাত্রিব্যাপী দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে, তখন মানুষের ঢের অবসর জুটবে। এখন যেমন মানুষ কাজের চিন্তায় ও চেষ্টায় হন্নে হয় তখন মানুষ হন্নে হবে সময় কাটাবার চিন্তায় ও চেষ্টায়। খেলাধুলা ত' এখনই বেড়েছে, তখনকার দিনে কি হবে? রাষ্ট্রের কর্তারা প্ল্যানিং শেষ করে যখন সমাজ-ব্যবস্থা সুস্থির করবেন অমনি আবার অস্থির হয়ে পড়বেন তাঁদের নেশানের অবসর যাপনের ভাবনায়। হয়ত পররাষ্ট্র সচিবের তখন প্রধান কর্তব্য হবে—পররাষ্ট্রিক ডিপ্লোম্যাসি নয়, এমন কি উৎপন্ন ও পণ্যজাতের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিও নয়—আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা। আরও আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার কমিটি বসবে, কন্‌ফারেন্স, কমিটি, লীগ্‌ অব্‌ ফিল্‌ম্‌ ফান্‌স্‌, লীগ্‌ অব্‌ টকার্স, লীগ্‌ অব্‌ ফ্লেপার্স ঘন ঘন বসবে, না হলে সময় কাটবে কেন? কাজ না থাকলে আজকের দিনে মানুষ টো টো করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, এভারেস্টে ওড়ে, উড়ো জাহাজে ডিগ্‌বাজি খায়, দেখে আসে অন্তত পক্ষে দেশ-বিদেশ। কিন্তু মানুষের এই ভবঘুরে বৃত্তি-ও নাকি আর টিকবে না—মানুষ এখন 'এক ঘরে' নেই, হয়েছে 'ভবঘরে'। স্পীড-এর দৌলতে আমার কাছেই দিল্লী-আগ্রা যেন এপাড়া-ওপাড়া; মুখুজ্জে বা রামকুমারজী সকালবেলা পুরীতে সমুদ্রস্নান করতে উড়ে যান, ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে পাটের বাজারে দালালি করেন—শ্রীক্ষেত্র বা নীলাচল আর সেই সুন্দর কল্পনার জগতে সুদুর্লভ তীর্থ নেই। পৃথিবীর সমস্ত Yarrow Visited হয়ে গেলে মানুষ আর অত ভ্রমণের নেশায় পাগল হয়ে উঠ্‌বে না। "ঝঞ্ঝামদমত্তরসে" আমাদের পাখা যখন পৃথিবীর কূলে কূলে ছুটে

ছুটে দেখবে নতুন-পৃথিবী নেই, তখন আবার কেঁদে উঠবে, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, আর কোনখানে।"

'স্টেট্‌স্‌ম্যান' যাই বলুন, মানুষের সভ্যতা আজ তাকে একদিকে যেমন কাজের তাড়ায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি তার জন্য খুলে দিচ্ছে—তপস্যার তপোবন না হোক্—বিশ্রামের খুশবাগ—Palace of Culture. এই সভ্যতা যদি সত্যি আপনার মাতলামো শুধ্‌রে নিতে পারে তবে সে অসীম আত্মপ্রকাশের ও ভোগ-বিলাসের অধিকারী হবে। মানুষের দেবতা সেজন্য অবকাশের বর হাতে নিয়ে বসে আছেন—মানুষ তা হাত পেতে নিতে পারলেই হয়। মার্কিন টেক্‌নোক্র্যাসির হিসাব বলে, গড়ে দিনে চার ঘণ্টার বেশী মানুষের খাট্‌বার প্রয়োজন নেই। সে হিসাব যত ভুলই হোক্, মানুষের খাটনির হার যে কম্‌ছে সে ত' স্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর মজুরের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হ'ত কি 'আটচল্লিশ ঘণ্টার হপ্তা'? কিম্বা ষাট ঘণ্টারই হপ্তা? পৃথিবীতে এ-কয় বৎসর ধরে অতি-উৎপাদনের ফলে সামাল-সামাল ডাক পড়েছে। বণ্টনরীতি সুস্থির হলে উৎপাদন কমিয়ে দিলেও মানুষের মজুরি কম্‌বে না, কম্‌বে শুধু শ্রমের সময়।

অবসর বেড়েছে, বাড়ছে, বাড়বে—সে বিষয়ে সংশয় নেই। তবে স্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসের সব-এডিটররা তা বুঝছে কিনা তা জানি না। আমি এখানে বসে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি—'প্রবাসী' অফিসে থাক্‌লে হয়ত একটা নিবন্ধও লিখতে পারতাম—এবং অবসরের সময়টা যেত তারই প্রুফ দেখতে। কারণ বাংলা দেশে—বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে—অবসর-বৃদ্ধি ঘট্‌তে দেরি আছে। কারণটা অবশ্য অর্থনৈতিক। আর অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য সাধিত না হতে সমাজে অবসর-সমস্যার উদয় হবে না, 'বেকার-সমস্যাই' ততদিন জেঁকে থাকবে।

কাজেই বাঙালী জাতের জন্য Y. Y.-র বা স্টেট্স্‌ম্যানের ভাবতে হবে না। আমরা অন্তত আড্ডা মারতে জানি।

অবসর কি একটা সমস্যা? কেরানীগিরি থেকে অবসর পেয়ে ল্যাম্ব্‌ অবসরের ভারে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। পেন্‌শন্‌ নিলে অনেকেরই ও অবস্থা হয়। কিন্তু সত্যই কতটুকু অবসরের আস্বাদন তাঁরা লাভ করেন যে অবসর বিষয়ে তাঁদের মত আমরা গ্রহণ করব? বড় জোর 'দশটা পাঁচটা'র থেকে মুক্তি, এই তো? বরং বন্দিশালার আমরাই পৃথিবীতে নিশ্ছিদ্র অবকাশ-লোকের বাসিন্দা—আমরাই বোধহয় এ বিষয়ে Expert opinion দেবার অধিকারী! পৃথিবীতে Idle rich অনেক আছে, Idle poor-ও আছে;—কিন্তু তাদের হাতে এখনো ঢের কাজ। এক দলের জন্য নাইট ক্লাব বা পৃথিবী-ভ্রমণ আছে, এমন কি বহু বহু ক্লাব বা বৈজ্ঞানিক বা আর্টিস্টিক সমিতির অনারারি সভ্যপদ-ও আছে। অন্যদের জন্য আছে খোলা পথ—ভবঘুরে বৃত্তি। কিন্তু তাঁরা কেউ অবকাশের অন্তঃপুরে পৌঁছতে পারেন না, একটা-না-একটা কিছু তাঁরা পান ও গ্রহণ করেন। অতএব তাঁরা হচ্ছেন কাজের জগতের ফেরারী—যাঁরা···অকাজের জগতে পাড়ি জমান। নিছক অবসরের রসাস্বাদ তাঁদের ভাগ্যে জুটেনি। সে রসোপলব্ধির সুবিধা আছে—নির্বিকার, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক শূন্যের মধ্যে আত্মবিলোপের সুযোগ আছে—একমাত্র আমাদের,—যাদের প্রচুর অবকাশ ভরাবার জন্য না আছে প্রাণ, না আছে নতুন বই, না আছে এমন কি Y. Y.-র সরস-নিবন্ধ—বন্দিশালার দেউড়ি পার হওয়া তার পক্ষেও দুঃসাধ্য।

যদি ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের আর্থিক প্ল্যানিং তাড়াতাড়ি সমাধা হয়—বলা বাহুল্য তা'হলে তাদের রাষ্ট্রিক দুর্ভাবনা-ও সেই সঙ্গে সমাধিলাভ করবে। কোল যা বলেছেন সণ্টার-ও তাই স্বীকার করেন—ইকনমিক সমস্যা পলিটিক্যাল সমস্যার সঙ্গে

টানাপড়েন বোনা রয়েছে। যুদ্ধ-ঋণের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের টাকার যোগ, তার সঙ্গে যোগ মার্কিন-মুলুকের আর্থিক-জীবনের। তার আর্থিক Nationalism ও খাতকদের international ঋণশোধ একসঙ্গে চলে না। নিউ ইয়র্কের শেয়ার মার্কেটের অকস্মাৎ পতনে জার্মানি তাই ধরাশায়ী, পাউণ্ড কুপোকাত, আর স্বয়ং মার্কিন জাত উদ্‌বাস্তু। এদিকে পুঞ্জীকৃত পলিটিক্যাল অবিশ্বাসে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। না ছাড়ে টাকার তাড়া, না কমায় অস্ত্রশস্ত্রের খরচ। অতএব, আর্থিক প্ল্যানিং আয়ত্ত হলে—সে কোলের কথা মতই হোক্ বা গ্রিস্কোর মতে সোস্থালিজমের ভেল্কিতেই হোক্, বা সল্টারের কথা মত নয়া-ক্যাপিটালিজমের চেষ্টাতেই হোক্, নিশ্চয়ই তার পূর্বে—কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে—রাষ্ট্রিক (পলিটিক্যাল) শান্তি ও সুস্থিরতা সর্বরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন তা'হলে কী দরকার হবে? Lions and Christians? আরও Matadors? আরও ক্রিকেট্, বেস্ বল্, দৌড়-ঝাঁপ, আরও ফিল্ম্, আরও নাইট ক্লাব?—সম্ভবতঃ এ সবই, এবং হয়ত আরও অনেক। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ বা অলডাস্ হাক্‌স্‌লি কেন তার বিভিন্ন তালিকা রচনা করুন না? কিন্তু আমাদের দেশটাই কি সেই অদূরস্থ Peace and order বা Peace and security-র যুগল-দেবদূতদের পক্ষ-যুগলের চিরাকাঙ্ক্ষিত ছায়া থেকে বঞ্চিত হবে? নিশ্চয়ই নয়। সেদিন আমাদের দেশেও 'সাহেবলোগ' বিনা পাহারায় পথে বেরোবে এবং আমরাও বিনা-আপত্তিতে ভালো ছেলের মত তাদের ইম্পিরিয়াল পীসের ছত্রচ্ছায়ায় 'দশটা পাঁচটা' না করে 'দশটা চারটা' করব—তারপর মোহনবাগান বা সিনেমা। কিন্তু মনে রাখতে হবে তখন 'প্ল্যানড ইকনমি' দেশে দেশে স্থাপিত। সব দেশের লোকে সেই নতুন ব্যবস্থায় আশাতীত অবসর হাতে পেয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। কাজ যা আছে তা সামান্য।

অকাজও আর যথেষ্ট নেই। হাইড-পার্কে অবসর-সমস্যার বিরুদ্ধে সভা হচ্ছে, নাইট্ ক্লাবের বা হলিউডের আকর্ষণীয় নগ্নসৌন্দর্য আর যথেষ্ট আকর্ষণীয় নেই—কিছুতেই আর 'শানাচ্ছে' না—ফুটবল-খেলা এক ঘণ্টায় শেষ হ'ল বলে দর্শকের দল খেলোয়াড়দের মারপিট করছে, বাকী সময়টা তারা করবে কী? দাঙ্গাবাজরা চড়াও হয়ে বল্‌ডুইনের তামাকের পাইপ কেড়ে নিয়েছে, বুঝুক্ মজা, অবসর-সমস্যা কি সর্বনাশী! তখন—তখন—পৃথিবীর সে ঘোরতর সমস্যায় ডাক পড়বে আমাদের—আমরা যারা এখন specializing in leisure! আর আমাদের অভিজ্ঞতা অমূল্য। আমরা পরামর্শ দেব মঙ্গল গ্রহে এই দাঙ্গাবাজদের অন্তরীণ করো—অবসর অভ্যাস করবার মত স্থানই হল ডিটেনশান ক্যাম্প।

পলাতক

অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা বেশী হয় না। দেখা হলে মনটা খানিকক্ষণের মত একটা বড় আকাশের সংবাদ পায় এবং ছোট ছোট পরিচিত মজলিসগুলির হাল-খবর আপনা থেকেই জানতে পারে। একদিকে ওঁর কাছে শোনা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হচ্ছে ও হবে, কে কোন্ বিষয়ে কোন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন, বাঙলা দেশের আর্টীয় আয়োজন কোন্ পথ ধরছে, সঙ্গীত সাধনা কোন্ বিপথে পা বাড়াচ্ছে—এইসব জড়িয়ে দেখতে পাই তাঁর উদ্দাম প্রাণশক্তি ও প্রচুর sense of humour; আবার অন্য দিকে জানা যায় কোন্ বাঙালী কবি নূতনতম কি লিছেছেন যা তাঁর বন্ধুসমাজ বলেছে, বাঙালীত্বের চরম অবদান, কোন বাঙালী কাগজওয়ালা কি নূতন ঢং ধরেছেন ও কোন্ সাহিত্যিক আড্ডায় 'কালচারের' কোন্ নবতর নৈবেদ্য সাজানো হচ্ছে। বৃহৎ খবরগুলির অপেক্ষা এই মজলিসী গল্পগুলিতে আমার interest কম নয়। (সত্যি সত্যি কি আমি লোকটা নিন্দুক যা বন্ধুরা এখানে সবাই বলে? না ওটা আড্ডার গুণ?) বাজে কথায় আমার বরাবরই অত্যধিক রুচি। বাজে কথা চলে মানুষের কাজ-কর্ম, হাল-চাল নিয়ে; তাতে যেন মানুষের রূপ আমি দেখতে পাই। এই হল আমার মনের বিশ্বাস অথবা মনের ওজর। যাই হোক, মোটের উপর কোন্ আড্ডায় কি হচ্ছে, কার নূতন হাল কি এবং কোন্ নূতন হাস্যকর বা লজ্জাকর ঘটনা ঘটল তা জানতে আমার ভালো লাগে এবং বড় আকাশের

খবরের মতই এই সব ছোট গৃহকোণের খবর অধ্যাপক মহাশয় আমাকে বলতে ভুল করেন না। তারপর আমার মন আপনি খোরাক জুটিয়ে নেয় তাঁর কথা থেকে।

গতবার জানা গেছল যে, 'সোজন বেদিয়ার ঘাট' নামে জসীমউদ্দীনের নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ডাঃ দীনেশ সেন মহাশয় প্রমুখদের patronage নিয়ে বাঙলা দেশের বাঙালী মনের একমাত্র চরম বাণী বলে কোন্ পাব্লিক সভায় কীর্তিত হয়েছে। সেই খাঁটি পল্লীগাথার কবিটির মাথা তাতে ঘুরে গেছে, অনেকেরই তা সন্দেহ। একদিকে দীনেশ সেন ও অবনীন্দ্রনাথ আর দিকে নব্য মোস্লেম সমাজের তারিফ, মাঝখানে ব্যাচারী কূল পাচ্ছে না। নিজের folk mind-এর সুর ও ধ্বনিটি এই কলকাতার পথের ভিড়ে রক্ষা করতে পারবে এমন আশা করা বড় কঠিন। পাঁচ বৎসর পূর্বেই প্রবাসী আপিসে তার মুখে আফসোস শুনেছিঃ সে তার কবিতায় সুন্দর সুন্দর শব্দ লিখ্‌তে পারে না—যেমন নজরুল লেখেন, তার সুর ও ছন্দ তেমন করে বাজে না—যেমন বাজে অচিন্ত্যবাবুর না আর কার ইত্যাদি। কেমন করে ওসব জিনিস পাওয়া যাবে, সদ্য শহরাগত জসীমউদ্দীন তাই জানতে চাইতো। তখনো জসীম ছিল গ্রামের সরল ছেলে, শহরের দোকানের চোখ-ভুলানো জিনিস দেখে সে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চয়ই পাঁচ বছরে জসীম শহুরে হয়েছে এবং বুঝেছে যে এই দোকানদারেরা এমনি আশ্চর্য জীব যে তারা ধানক্ষেতের নামে মেতে ওঠে। অতএব, এদেরকে মুগ্ধ করতে হবে ধানের শিষ দিয়ে—সেই ধানক্ষেতের গান দিয়েই যে 'ধানক্ষেত' আজ জসীমের জীবন থেকে সরে গেছে, এখন যা তার কাছে আর তেমন সহজ ও একান্ত সত্য নেই। গুলু ওস্তাগর লেনে বসে তাই ব্যাচারী নিজের পুরানো দিনগুলির থলি ঝেড়ে-ঝুড়ে এখনো লিখছে পদ্মার 'বালুচরের কথা', 'ধানক্ষেতের' গল্প আর

'সোজন বেদিয়ার ঘাট' (?)—কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে গুলু ওস্তাগর লেনের ছায়া, ক্ষীণ communalism cum artificial rusticity—আর এই ছায়াটুকু আছে বলেই শহুরে লোকেরা বলতে পারছে 'কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!' তবু ভালো। জসীমউদ্দীন লোক মন্দ নয়, দীনেশবাবুর পঁয়ত্রিশ টাকার বৃত্তির জন্য ও যা খেটেছে তাতে দীনেশবাবু ওকে প্রশংসা করে ভালোই করেছেন। কিন্তু সবাইতো আর সেই service জসীমের কাছ থেকে পান নি। তা ছাড়া, তাঁদের নিজেদেরও এক-আধখানা কাব্য-কুঠার আছে, তাতে তাঁরা শান দেন। তাই তাঁরা নিশ্চয়ই ক্ষেপে যাবেন; বলবেন, 'ছোঃ' 'সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য'। অথবা 'বাঙলার মানস-লোকের মর্মবাণী কি এসব গেঁয়ো কথা?'

কিন্তু জসীমউদ্দীন নয়, অধ্যাপক গল্প করে চলে গেলে বেশী করে মনে পড়তে লাগল আমাদের পুরানো সাহিত্যিক আড্ডার বন্ধুদের কাণ্ড! সম্প্রতি 'সিতেশ বাঁড়ুজ্জের কাণ্ড' বলে 'উত্তরা'তে একটি বিদ্রূপ কাহিনী পড়ে আমার সে আড্ডার বন্ধুদের কথাই বেশী করে মনে পড়ছিল। বুদ্ধদেব বসুর গল্পটা বাজে, কিন্তু তাই বলে মানুষগুলোর কাজ-কারবার কম মজার নয়। নানা রকমের লোক আসত সেখানে,—কারও ছিল illusion, কারও ছিল moral bias, কারও সাহিত্যিক fanaticism। কিন্তু সবসুদ্ধ একটি আড্ডা! বাঙলা দেশে তখন (দশ বছর আগে—'কল্লোল'-কেন্দ্রিত ও 'শনিবারের চিঠি' কেন্দ্রিত) সাহিত্যের বাজারে কবির লড়াই চলেছে—এখানে বসে এখন তা স্মরণ করে উপভোগ করতে পারি—তখনও যে না পারতাম তা নয়। কারণ, দলের হলেও আমি দাদার মতই জানতাম—ব্যবধানটা এপিঠ-ওপিঠের। তাই যে একটু সাহিত্যের বাজারে কম শক্তিশালী সে বেশী শক্তিশালীকে দাবিয়ে রাখতে চায় মুখখিস্তি করে ও দাঁত বের করে। অন্যেও অবশ্য 'অবাক হনু'—অর্থাৎ মুখ খিঁচোতে এবং ভেঙচাতে ছাড়ে না। এবং রাগের মাথায়

পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা যেমন স্বেচ্ছায় উলঙ্গ হয়ে পরস্পরকে কল্পিত অত্যাচারে জব্দ করতে চায়, দু'পক্ষেরই কেউ কেউ সাহিত্যেও সেই হাস্যকর কলহ-পদ্ধতি (অবশ্য, modernism-এর নামে ও creative literature-এর উদ্দেশে) অনুসরণ করে মোটের উপর দর্শক-দলের আশা পূর্ণ করেছেন। 'বাঁড়ুজ্জের কাণ্ড' সে তুলনায় কিছুই নয়—লেখকের লক্ষ্য আমাদের সিতেশ, তাঁর সাহিত্যকৃতিত্বে লেখকের ঈর্ষা। কিন্তু ঈর্ষাকে মানুষের মত প্রকাশ করার সাধারণ সাহস নেই, আর আত্মচেষ্টায় জয় করার মত পৌরুষও লেখকের নেই। Willing to injure afraid to strike—এই মনোভাবটা লেখাটিতে প্রকট। অথচ, সিতেশকে ভয় করবার মত কী আছে? সে তো মোটেই ভয়াবহ নয়।

ভালোমন্দে জড়িয়ে ওই 'সিতেশ' লোকটি delightful—তাঁর Homeric বড়াই ও Lilliputian কেঁই-কেঁই—কবিত্বের সঙ্গে ছেলেমানুষি, সাংসারিকতার সঙ্গে কল্পনাপ্রবণতা, আত্মপ্রশংসা-লোলুপতার একটা naivete তাকে বেশ একটি মজার মানুষ করে রেখেছে। দেববাবুরা তাঁকে হিংসা করলে কী হবে? একটি সত্য ঘটনাকেই সম্ভবতঃ ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা হচ্ছে সৃষ্টিতে পরাজিত হতাশায় শাদি-বৃত্তি। অথচ ও বিদ্রূপে তিনি আরও ব্যর্থ। অল্‌ডাস হাক্‌স্‌লির নকল করে যিনি cynicism ঝেড়ে নিজেকে নির্বিকার বলে জাহির করতে সতত উন্মুখ তাঁর লেখায় ঈর্ষাপরায়ণতা ধরা পড়লে সমস্তটাই মনে হয় মেকি—লেখা ও মানুষ এ তুলনায় সিতেশ অনেক খাঁটি—কারণ যত কাণ্ডই করুন ঈর্ষা তাতে নেই। সিতেশের জীবনে অনেক ছোট-ছোট incongruities আছে, তাতে কী যায় আসে? তিনি তো বলেনই জীবন অমনিতর, ছোট-ছোট সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্য দিয়ে সেই অপরাজিত প্রাণশক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে। ঘটনাগুলি হয়ত বা হাস্যকর কিম্বা করুণ, কিন্তু প্রাণশক্তির

লীলাটি হচ্ছে solemn এবং sublime. অতএব যে সিতেশবাবু হাস্যকর, এমন কি সময়ে সময়ে (তাঁর বন্ধুর সস্নেহ পরিচয়ে) 'বাঁদর', তাঁকেও আমার সমস্ত মানুষটির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে অসুবিধা হয় না। কলকাতা থেকে মাইল পনের দূরে বন্ধুদের জোর করে বেড়াতে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সে কী অন্বেষণ সেই পাড়াটি যেখানে তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে তাঁর শৈশবে থাকতেন। পাড়ার এক বৃদ্ধকে দেখে চিনলেন (মনে মনে), তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "এ পাড়ায় অমুক নামে কেউ থাক্‌তো আপনার মনে আছে?"

"অমুক—? হ্যাঁ, মনে পড়ে। সে তো অনেকদিনেরই কথা।"

"তা হবে। আচ্ছা, তার একটি ছেলে ছিল বুঝি—"

"একটি না ক'টি মনে নেই, তবে ছেলেপিলে ছিল। কত দিনের কথা—"

"বড় ছেলেটির নাম আপনার মনে পড়ে?"

"না। কেন বলো ত'?"

"অমনি।······সিতেশ বা সিতু অমনি কিছু আপনার মনে পড়ে?"

বৃদ্ধের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল: "পড়ে—তারই বড়ছেলের নাম। কিন্তু তুমি কি করে জানলে। তুমিই কি সে?"

"না, না—আমার একটি বন্ধু ছিল সে।" সিতেশবাবু উঠে পড়লেন—পালাবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু বৃদ্ধ ততক্ষণে 'সচেতন' হয়েছেন!

"বসো না। হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে, তুমিই সে,—না ভুল হয়নি।"

সিতেশবাবু আর দাঁড়ালেন না। অমন-একটি সামান্য দরিদ্র পল্লীতে তিনি বর্ধিত হয়েছেন একথা বন্ধুদের সামনে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন কি? অথচ, ভূতে-পাওয়া লোকের মত ওখানে তিনি যাবেনই, একা নয়, বন্ধুদেরও নিয়ে যাবেন। আর নিজের লেখায়

তো এ তথ্য তিনি অস্বীকার করেন নি। তাঁর পিতার ডায়েরিতে তিনি তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণের সময়ে একটি বাড়িতে আতিথ্যের ও সেখানকার একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ পান। তা নিজের উপন্যাসে হুবহু ব্যবহার করেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল থেকে যখন এক ভদ্রলোক (তিনিও নামকরা লোক) জানালেন যে, অমনিতর সত্যি এক ঘটনা ঘটেছিল তাঁর বাড়িতে, ঠিক অতদিন পূর্বে। 'আপনি কি সেই-অতিথি মহোদয়ের কোনও আত্মীয়?' অমনি আর কথা নেই—অর্থাৎ সিতেশবাবু backward march—লিখলেন তাঁকে: 'ওসব উপন্যাসের গল্প, আমি কারো কিছু নই।' কেন তাঁর এই ভীতি? তেরো বছরের কোনো বালিকাকে তাঁর ভালো লেগেছিল—তাকে তিনি উপন্যাসের পাতায় বড়লোকের মেয়েরূপে চিত্রিত না করলে সম্পূর্ণ সুখ পান না। ঠাট্টা করলে মর্মাহত হন, বলবেন, 'sacred experience' নিয়ে ইয়াকি করছেন। কোন্ বারো বছরের গেঁয়ো মেয়ে গোপনে তাকে আচার দিয়ে গেছে (হয়ত একটু আদরের নিদর্শন, কিম্বা হয়ত নিতান্তই সাধারণভাবে), সিতেশ তা সযত্নে বয়ে এনেছেন, বোতলে তুলে রেখেছেন। খেয়ে দেখা গেল, অখাদ্য—কিন্তু তা হোক্, ওর দাম অন্যখানে, এ-ও 'sacred'। Spiritualism নিয়ে তাঁকে টিটকারি দিয়ে আমি অনুতপ্ত হয়েছি, হয়ত ওইটা তাঁর unconscious বা চেষ্টা করা বিশ্বাস; তাঁর স্বর্গগত পত্নীব প্রতি আকর্ষণের একটা রূপ। বহুদিন বিপত্নীক—ওদিকে বিয়ের শখ আছে, কনেও দেখতে পারেন, কিন্তু শেষ অবধি পালাবেন। এগারো বছরের কোন্ প্রতিবেশিনী বালিকার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক হয়েছিল, তখন ভেবেছিলেন: 'দূর ওকে কি বিয়ে করব?' বছর দুই পরে সে মেয়ের সঙ্গে আবার দেখা—বিয়ে হয়েছে, বড়-সড় হয়েছে, বেশ চট্‌পটে, গল্প কর্‌ছে তেমনি প্রতিবেশী কন্যার মত স্বচ্ছন্দে। সিতেশ বাবু ছাড়া আর কোন্ লোকে অমন innocently বলতে পারত ঠাট্টা করে: হ্যাঁরে কালি, তোকে যদি আমি বিয়ে করতেম?

—মেয়েটা হেসে পালাল। কিন্তু রাগ করতে পারলে না, বক্তাকে সে চেনে বলে, হয়ত খানিকটা likeও করে বলে। সিতেশবাবুকে সব জড়িয়ে like করতেই হবে, আর সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকলে তাঁকে, তাঁর বন্ধুত্ব-সাহচর্য, সবাই যাচ্ঞা করবে। গঙ্গার ঘাটে কি যোগে স্নানার্থীর ভিড়—ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি হচ্ছেন একজন চালক। বললেন, "দেখলাম হে, বাঙালী মেয়ের রূপ দেউলে হয়নি। বেশীক্ষণ কি মেয়েদের ঘাটের দিকে যেতে পাবি—সঙ্গে তো একপাল ছাত্র। আব ছাত্রদের-ও ঝোঁক ওদিকটাতেই।" আমরা বল্লাম: "মাস্টারদেরই ত তারা অনুগামী।" "তা দেখলাম একটি মেয়েকে। স্নানের শেষে, সিঁড়ির পৈঠায় দাঁড়িয়ে ভিজা চুল গামছা দিয়ে ঝাড়ছে—পায়ের সামনের আঙুল কয়টির উপর দেহের ভর রয়েছে"—দাঁড়িয়ে উঠে উৎসাহ ভরে ভঙ্গীটি বুঝিয়ে দিলেন। "ঝাড়ছে চুল, দুলে উঠ্‌ছে শরীর, সুস্থ নিটোল, চমৎকার। চোখে লেগে রয়েছে।" কাণ্ড দেখে বন্ধুদের হাসি পায়।—বারো বছরের কোন্ মেয়ের সঙ্গে বিপত্নীক সিতেশের বিয়ের কথা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন: "কি বলো? দেখতে শুনতে চমৎকার,—ফর্সা রঙ, গোল মুখখানি, গড়ন-ও একটু মোটাসোটা, গোল-গাল, ঠিক যেমনটি চাই— "

"কিন্তু বারো বছর না?"

"হ্যাঁ"

"লজ্জা করে না। আপনার বয়স যায় পঁয়ত্রিশের দিকে। একটা বারো বছরের মেয়েকে করবেন বিয়ে?"

"আহা-হা"—শক্ত মুঠো-সুদ্ধ কসরতের ভঙ্গীতে দুই হস্ত অর্ধ প্রসারিত করে বললেন: "Development আছে।" ভঙ্গীতেই সব স্পষ্ট—বক্তার লুব্ধ দেহাশ্রিত মনোবৃত্তিটি পর্যন্ত। কিন্তু হাসি পাবে না কার? জব্দও মাঝে মাঝে হন—সেই যে পূর্বকালের একটি প্রতিবেশিনী—'তাকে আমার বেশ ভালো লাগত, ওর-ও ভালো লাগত আমাকে'—বিয়ে হয়েছে কলকাতায়—তাকে খুঁজে খুঁজে

একদিন বহু বর্ষ পরে দেখতে এলেন তার শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। বাড়ির লোকেরা বউমায়ের আত্মীয়কে খুব যত্ন করলে, জলখাবার দিলে, কিন্তু সে (মনে করা যাক তার নাম, মুখী) এলো না। সিতেশবাবুও ওঠেন না। এ বাড়িতে কি কাজ—বাড়ির লোকেরাও সবাই ব্যস্ত। বেশীক্ষণ বসে কেউ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারছে না, উঠে ভিতরে যাচ্ছে। সিতেশ একা বসে থাকেন—মুখী আসৃছে বোধ হয় এবার। কিন্তু কেউ আসে না—বাড়ির ভিতরে বেশ ব্যস্ততা। এক একবার কে যেন হঠাৎ খুব তীক্ষ্ণস্বরে এক-একটা চীৎকার করে উঠছে,—মাঝে মাঝে তা কানে যাচ্ছিল। এদিকে সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে জমে উঠ্‌ছে। সিতেশবাবু একটু নিশ্‌পিস করতে লাগলেন। শেষে সামনে দিয়ে একটি ভদ্রলোককে যেতে দেখে উঠ্‌লেন। চীৎকারটা আবার কানে গেল। বললেন, "এ শব্দটা কিসের বলতে পারেন ?" ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ আপনার সঙ্গে দেখা-ও করতে আসৃতে পারছি না। মেজ বউমায়ের আপনি সুবাদে দাদা ; অথচ দেখুন কি মুস্কিল ব্যস্ত আছি সবাই।"

"শব্দটা কিসের ?"

"ওইতো, মেজ বউ মা। দুপুর থেকেই অম্‌নি চলেছে কি না—খুব কষ্ট পাচ্ছেন। তবু তো দেখুন প্রথম নয়—এবার নিয়ে তিনবার পোয়াতি হয়েছেন—কিন্তু প্রত্যেকবারেই এরকম। বসুন আপনি।"

বসতে আর হল না। সেই ভালো-লাগা প্রতিবেশিনীকে দেখবার সাধ আর কোনোদিন তার "ভালো লাগা দাদার" হয়নি।

আমাদেরই একজনকে বলছেন—তখন ১৯৩০ এর মাঝামাঝি—(একজন মেয়ে কংগ্রেসকর্মী জেলে গেছেন ধরা যাক্ তাঁর নাম—বুনো) 'বুনো নাকি দেখতে কুৎসিত—ছ মাস ছেড়ে ওর ছ বছর জেল হলেও ক্ষতি হত না।'

বুনোর সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় নেই বুঝা গেল। ক'দিন পরে শুনলেন কুৎসিত 'বুনো' নয়, 'জুনো'—আর একজন। "তা হোক্

গে, ওর-ও জেলই হওয়া উচিত।” আরও কয়দিন পরে শুনলেন আমাদেরই একটি বন্ধুর সঙ্গে ‘বুনোর’ বেশ পরিচয় আছে।

সিতেশ বাবু শুনে বিষণ্ণ হলেন, বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: “ওদের সঙ্গে পরিচয় কি করে করলেন?”

বন্ধু রঙ চড়িয়ে বললেন: “আমি কি করিছি—হয়ে গেল। তারপর দেখেনইতো ওদের, নিজ থেকেই ওরা পরিচয় বজায় রাখে।”

“তাইত—” সিতেশ বাবু একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন।

বন্ধু আর একদিন মিথ্যা করে বললে, “বুনো কিন্তু আপনার পাঁচালির খুব প্রশংসা করলে।”

সিতেশ বাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, “কি বল্লো, কি বল্লো?”

বানিয়ে বল্‌তে কষ্ট হল না—কি বললে লেখক বিশেষ তৃপ্ত হন তাতো জানাই আছে বন্ধুর। প্রশ্ন কিন্তু শেষ হয় না। “ওই এপিসোড্‌টা—লীলা না, না, ওটা খুব খাঁটি জিনিস। আচ্ছা দেখা হলে আমি বুনোকে বুঝিয়ে দোব। একদিন আপনি বল্‌বেন তাকে।” কিন্তু বন্ধু তাকে কিছুতেই দেখা করিয়ে দেন না—ওই খানেই থেমে থাকেন; অথচ সিতেশ বাবুরও মনে ওই ইচ্ছাটা বেশ মোলায়েম ভাবে ঘুরে ফিরে বেড়ায়—বুনোর সঙ্গে দেখা করা যায় কি করে।—সিতেশের ঈর্ষার রূপ এই পর্যন্ত।

কিন্তু সিতেশ বাবু ছিলেন আড্ডার প্রান্তাশ্রয়ী। তাঁর অর্থলোভ সত্ত্বেও তিনি ধার দিয়ে ফেলেন। দারিদ্র্য-স্মৃতি তাঁকে সাবধান করেছে কিন্তু অনুদার বা কঠিন করতে পারেনি—তাঁর পক্ষে এইটিই যথেষ্ট বড় কথা। আর তাঁর ভিতরে যে একটি কবি-মন আছে সে তো অতি—প্রত্যক্ষ। মোটের উপর লোকটা নিজে যা তা ছাড়া অন্য কিছু বলে চালাতে ব্যস্ত নন। সহজ বড়াই আছে—কিন্তু কোনো সহযোগী লেখকের প্রতি ঈর্ষা তাঁর নেই।

অতিথি

সুষেণ যেদিন চলে গেল, সেদিন তার কথাটা বল্‌তে বল্‌তে যে থেমে গিয়েছি। আজ তার কথাই বলছি—যতটা পারি তার কথাতেই।

সুষেণ ভবঘুরে—পাকা ভবঘুরে—বাঙলা দেশে এ জাতের লোক তুর্লভ। পূর্বকালে বোধ হয় এসব লোকই সন্ন্যাসী হয়ে বেরোতো—পথে পথে ঘুরবার লক্ষ্যহীন আকর্ষণে। এখন তারা করে কি—দেশের সেই ভবঘুরেরা? গ্লোব ট্রটিং ফ্যাসান হয়নি, সাইকেল-দাবড়ানো যাদের কাজ তারা অনেকেই ভবঘুরে নয়, তারা একটা কিছু করতে চায়। কিন্তু যারা খাঁটি tramp তারা কি করে? সুষেণকে দেখে তা বুঝা যায় না—কারণ, ওর ইণ্টেলেকচুয়াল একটা ধাৎ আছে এবং ইমোশ্যানাল বা এ্যালট্রুইষ্টিক তুর্বলতাও চরিত্রগত। এ সব জিনিসও বোধ হয় ওর ভবঘুরে-বৃত্তির মত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত—ওর ঠাকুরদাদা ব্রাহ্ম হয়ে যান, ওর বাবা বালক বয়সে ঘর ছেড়ে ঘুরতে বেরোন—এর পরে কি আর হেরিডিটি জিনিসটাকে চোখ বুজে অস্বীকার করা সহজ? "দশ বৎসর বয়সে যখন পা দিলুম," সুষেণ একদিন বলছিল, তখন সে একটা মিশনারী হোষ্টেলের অধিবাসী, "আমাকে পেয়ে বসল ঘূর্ণীবায়ুতে। কি যে হল বলতে পারি না। ইস্কুলের কাছেই হোস্টেল, সাহেব অভিভাবকের নজর কড়া, মাস্টারেরাও হতাশ হয়ে উঠ্‌ছেন—কিন্তু কি ইস্কুলে যাব আর কি ঘরে ফিরব? আমার পথে পা দিতে পারলেই হল, সব ভুলে

যেতাম। কোথায় যেতেম, নিজেই জানি না; কোথায় যাব, নিজেই জানতেম না,—শুধু এই পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। ধুলোয় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেত, রোদে চোখ-মুখ বসে যেত নিশ্চয়, আমার সে-সব খেয়ালেই আসৃত না। ক্ষুধা-তৃষ্ণাটা পর্যন্ত বোধ থাক্‌ত না। একবার সকাল নয়টায় খেয়ে নিয়ে হোস্টেলের গেটের বাইরে আসৃতে পারলেই হত। রাত্রি সাড়ে সাতটায় সে গেটে তালা পড়ে—তখনো ফিরতে ইচ্ছা হত না। দেরীতে ফিরে পেতেম মারধর, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার। ইস্কুলে মাস্টাররা মেরে মেরে হতাশ হলেন, হোস্টেলের কর্তাদের শাসন উপদেশ, জরিমানা, সব ফেল হল— আমার ঘূর্ণীরোগ সারে না। একদিন নয় দুদিন নয়, বৎসর ঘুরে গেল, পরীক্ষায় ফেলের সীমানায় প্রায় ঠেকেছি, বাবার কাছে চিঠি গেল: আপনার ছেলের কিছু আশা নেই। সাহেব সংরক্ষক দুঃখিত ও রুষ্ট হয়ে তাঁকে লিখলেন: ভালো মনে করলে আপনার ছেলেকে অন্যত্র রাখবার ব্যবস্থা করতে পারেন। অপরাধও বাবা শুনেছিলেন, তাই বিস্মিত হলেন না, ভাবলেন:—যা হবার হোক। ছুটিতে বাড়ি যেতে আমার হত না, বাবা ঘুরে বেড়াতেন মফঃস্বলে। সে সময়টা আমি আমার মনের সাধ মিটিয়ে ঘুরতে পেতেম। থাকতেম হোস্টেলেই, সঙ্গী থাকত আর একটি মাত্র ছেলে—তারও বাড়ি যেতে হত না। তার পিতা বন-বিভাগে কাজ করতেন; স্ত্রীবিয়োগের পর সে অঞ্চলের একজন পাহাড়ী মেয়ে নিয়ে সংসার করছেন—ছেলেকে এই অসামাজিক সংসারের কাছে ঘেঁষতে দিলে পাছে তার মনে কোনো আঘাত লাগে তাই বাপ ছেলেকে রাখতেন এই প্রবাসে ছাত্রাবাসে—ছুটি পেলেই ছুটে তাকে দেখতে আসতেন; আর তাকে পাঠাতেন অজস্র টাকা। সে টাকা, আমার ও তার অবাধ্যতার জন্য যে-অর্থদণ্ড হত, তার বহুগুণ; কাজেই কর্তৃপক্ষের শাসনের সেই শোষণক্রিয়ায় আমাদের দুঃখ পেতে হত না। ছুটিটা আমরা প্রাণভরে পথে পথে

ঘুরতেম—অবশ্য ও শহরটাতেই, বড় জোর শহরতলী পর্যন্ত আমরা অভিযান করেছি ; এ সময়টা আমরা পেটভরে খেতেম, চোখ ভরে দেখতেম মেলা, সার্কাস, ম্যাজিক, বাজি। সে সময়কার সেই মফঃস্বলের শহরের আজগুবি বায়স্কোপ—তাতেই আমাদের মন কি রকম নেচে উঠ্‌ত ! অথচ, মিশনারী অভিভাবক তা জানলে যে কি অবস্থা ঘটত তা বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমার সেরা সখ ছিল ঘোরা, পথে পথে শুধু—শুধু চলা। চোদ্দ বছরে যেদিন পা দিলেম তখন হোস্টেলের দুয়ার দিয়ে বেড়ানো ছেড়ে দিলেম। রাত সাড়ে নয়টায় আলো নিবে যায়—দড়ি বেয়ে দেয়ালের ওপিঠে পড়ে আমি চললেম রাতের শহরে পথে পথে ঘুরতে। কি দেখতেম তখন ? ঘোড়ার আস্তাবলে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে গাড়োয়ান গল্প জুড়েছে, পথের বড় বড় দোকান বন্ধ হচ্ছে, রাস্তায় লোক এসেছে কমে, খাবারের দোকানে অর্ধমত্ত গুণ্ডাদের গতায়ত, অদ্ভুত জাতীয়া মেয়েমানুষের সমাগম—তাদের বেশভূষা রীতিমত চমকপ্রদ। কিন্তু সেসব কৌতূহল আমার তখন বেশিক্ষণ টিঁকত না,—আমি চাইতাম পথে পথে ঘুরে নিতে। নির্জন গলি, জনবিরল সড়ক, ইতঃস্তত ঝিমন্ত গুণ্ডাদের আড্ডা, আর ঘুমন্ত পুরী—ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত ঢুলু ঢুলু চোখে এসে আবার দড়ি বেয়ে উপরে উঠতেম ও নিজ শয্যায় শুয়ে পড়তেম। ষোল বছর বয়সে আমি হলেম হোস্টেলের পাকা বাসিন্দা—আমিই হলুম মনিটার। খেলার মাঠের খাতায় নাম লিখিয়ে পেলাম সন্ধ্যার পর পর্যন্ত খানিকটা বাইরে থাকবার অধিকার। দরোয়ানও তখন খানিকটা খাতির করত। শাসনের বাঁধন একটু আল্‌গা হতে আমি 'দড়ির সিঁড়ি' ছেড়ে দিলেম—নানা ওজুহাত জুটত, খেলা, পড়া, ইস্কুলের নানাবিধ কাল্পনিক 'ডিউটি', তারপর 'মনিটারের' অধিকার ও privilege—আমার ভবঘুরে বৃত্তি এই প্রথম বাধা কাটিয়ে উঠ্‌ল।"

এর পরে সুষেণ এসে গেল কলেজের সীমানায়—তখন অবাধ অধিকার, বৎসরে তিনমাস ছুটি,—একটি দিনও তার বৃথা যায়নি।

পুরোপুরো সে তার trampingএর বৃত্তিকে চরিতার্থ করেছে—ভুটানে, পূর্ব বাঙলায়, আসামে, পার্বত্য মণিপুরে, ব্রহ্মদেশে—রেল গাড়ির ভরসা না রেখে শুধু একটি সুটকেস নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত পথে-বিপথে, সঙ্গী নিয়ে বা একা একা। আশ্চর্য, বিচিত্র, কৌতূহলকর সে সব কাহিনী—রাতে তারাভরা আকাশের তলে শোয়া, শিশিরভেজা মাঠের পরে তন্দ্রী থাক্‌ত শিয়রে, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গাছের তলায় আশ্রয় লাভ—আবার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা, অপরিচিত গৃহস্থের ঘরে অকুণ্ঠ আহ্বান, সরল চাষীর সঙ্গে বসে বসে গল্প জুড়ে দেওয়া, মাঝির ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো,—কত অপ্রত্যাশিত স্থানে হঠাৎ পেয়েছে অপরূপ আত্মীয়তা, আবার পিছনে ফেলে এসেছে কত তুর্দিনের সুন্দর বন্ধুত্ব। আমি শুনতেম,—হঠাৎ কোথায় আঁধার রাতে ভূতের ভয়ে প্রাণ উড়ে গেলে ভূত হঠাৎ বলে উঠ্‌ল: 'বিয়ে করবি, বিয়ে'? ধড়ে প্রাণ এল, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জমে যাওয়া হৃদ্‌পিণ্ড আবার হল স্বাভাবিক,—ভূত নয়, পাগলা মেয়েমানুষ।—হবিগঞ্জের কোন্‌ মুসলমান গাঁয়ে হঠাৎ দেখলে হিন্দুর মেয়ে। সুষেণকে দেখে চম্‌কে সে আবার ঘরে ঢুক্‌ল। সুষেণের মাথায় তখন 'নারী রক্ষা সমিতির' বক্তার চীৎকার ঘুরছে, "বীণা কোথায়? বীণা কোথায়?" ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প তৈরী করে পাড়ার চাষীর ঘরে সুষেণ হল অতিথি—নানা গল্পে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললে: 'মুসলমানের জেনানা এমন বেসরম হয়? শোনো আজ……"

শুনেই চাষী বললে: "ও মুসলমান কি করে? ও তোমাদের হিঁতু। হবিগঞ্জের বাজার থেকে, মাজু ওকে এনেছে —কসবী; আজ হবে ওর নিকে।" নারী রক্ষা সমিতির "বীণা কোথায়" বুঝা গেল।

তুপুর রোদে কোন জেলায় পথের পার্শ্বে একটি হিন্দু কচি ছেলের সঙ্গে আলাপ—তার বিধবা মাকে তার বৈমাত্রেয় ভাইরা ও জ্যেঠামশায় ঠকিয়েছে—সে সব তুঃখের কথা শুন্‌ল। ভাসা-ভাসা মনে নাড়লে,

সে জ্যেঠামশায় সুষেণেরই পিতার মামা হয় যেন। কিছুদিন পরে শিলেট থেকে শিলং নৌকা ঘাটায় সেই মামীর সঙ্গেই দেখা—অচেনা মামী, বিশেষতঃ কারও সঙ্গে তিনি সদ্ভাব রাখেন না, দারুণ স্বার্থপর। সুষেণ তাকে পরিচয় দিলে না। সেই মামী তখন বিধবা, ওকে চায় সঙ্গী করে রঙ্গপুরে জামাতার কাছে যেতে। ঘাড়ে চাপলেন সেই পিতার মামী, ওর দিদিমা। কিন্তু কিছুতেই সুষেণ তার বাড়িঘর স্বীকার করলে না। গেল সে যাত্রা। কোচবিহার না কোথায়, হঠাৎ দুজনায় আবার দেখা, একই আত্মীয়ের গৃহে দুইজনে তখন অতিথি। এবার আর পরিচয় অজানা রইল না। চাপলেন মামী ঘাড়ে।—সুষেণকে তার নিজ আত্মীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য তিনি অস্ত্র করতেন চান, নিজের কন্যার সঙ্গে আবার সম্পর্ক পাততে হবে, শহরের মধ্যেও আবার পজিশ্যান্ চাই (এখন সে স্বামীও নেই—টাকা থাক্‌লে কি হবে ?)। এবার সুষেণ আদায় করলে তার সাহচর্যের দাম—সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ওঁকে জুড়ে দিলে। সেই গ্রামের পথের পরিচিত কচি ছেলেটির কথাও সে মনে করে রেখেছিল।